ভূমিসাৎ হইয়া যায়। বিহার সকল একে একে মসজিদে পরিণত হইতে লাগিল এবং এতদ্ব্যতীত যত প্রতিমূর্ত্তি ছিল তাহা পুত্তলি বলিয়া এককালে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষের গৌরবের অন্তর্দ্ধান হয়।

হিন্দুদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের ঘোরতর তর্ক-যুদ্ধ হইয়া যখন বৌদ্ধেরা পরাস্ত হয়, তখন বিজিত দলের সঞ্চিত যত পুস্তক ছিল তাহার অধিকাংশ নেপাল প্রদেশে নিরাপদ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এই ধর্ম্ম চীন তিব্বৎ জাপান ব্রহ্ম এবং সিংহল দেশে আশ্রয় পায় এবং বৌদ্ধশাস্ত্র সমুদয় সেই সেই দেশের ভাষায় অনুবাদিত হয়। আজ সেই অনুবাদিত পুস্তকগুলি ফরাসী জর্ম্মণ এবং ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে। আমরা এই সকল পাঠ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বৌদ্ধসমাজের সমুদয় মূলতত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছি। ললিতবিস্তর বলিয়া যে বুদ্ধের জীবনী সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল তাহা তিব্বৎ এবং ব্রহ্মদেশে অনুবাদিত হয় এবং বিনয়শাস্ত্র সিংহল দেশে পালি ভাষায় সুন্দররূপ জীবিত আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! যে দেশে বুদ্ধের জন্ম, যেখানে তাঁহার ধর্ম্ম সহস্রবর্ষাধিক রাজত্ব করে সেখানে বৌদ্ধ সমাজের চিহ্নমাত্র নাই! কিন্তু সিংহল তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে যে সকল পুস্তক আছে তাহা হইতে আমরা সেই সমাজের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইতেছি। শাক্য দেখিতে কি-প্রকার লোক ছিলেন, তাঁহার মস্তকের কেশবিন্যাস কিপ্রকার ছিল, তাঁহার ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত কিম্বা ঈষৎ আলম্বিত ছিল, তাঁহার অঙ্গুলির নখগুলি তাম্রবর্ণ কিম্বা শুভ্রবর্ণ, তিনি বিশ্বাসীদিগের গৃহে কি খাইতেন, তাঁহার বস্ত্র কি বর্ণের ছিল—এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনের অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা পর্য্যন্ত আমরা কল্পনা

করিয়া লইতে পারি। আবার তাঁহার শিষ্যেরা কিপ্রকার খাদ্য আহার করিত, কি প্রণালীতে এবং পাত্রে উচ্ছিষ্ট না রাখিয়া অঙ্গুলি লেহন না করিয়া কিরূপ নিঃশব্দে আহার করিত, কিরূপ ঘরে শয়ন করিত, কি ভাবে পূজা করিত, কি মন্ত্র পাঠ করিত, পরস্পরকে কি ভাষায় সম্বোধন করিত, গুরুকে কেমন করিয়া সম্ভাষণ করিত, তাহাদিগের বিহার সকল কিরূপে নির্ম্মিত, এ সকলই যেন আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে অঙ্কিত আছে।

একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া গিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের কার্য্য-গুলি বৃক্ষস্বরূপ। কিন্তু পৃথিবীর বৃক্ষের সহিত তাহাদিগের এই প্রভেদ যে, তাহাদিগের মূল জলে থাকে এবং শাখা প্রশাখা সকল জগন্মণ্ডলকে ছায়া দান করে। বাস্তবিক ধর্ম্মবৃক্ষের মূল স্বর্গে। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে ইহা কি কখন সম্ভব হইত যে, হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা প্রশাখা সকলই কাটিয়া ফেলিয়াছে অথচ সেই বৃক্ষ আজ নব শাখা বিস্তার করিয়া অন্য সকল দেশের লোককে ছায়া দান করিতেছে! মূলে দৈব তেজ না থাকিলে আবার সেই ধর্ম্ম পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে পারিত না।

এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে যেমন নানাপ্রকার উপকার লাভ করা যায় তেমনি আবার স্বদেশানুরাগ বাড়াইয়া দেয়। ভারত যখন জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন কি ভাবে জাগ্রত হয় তাহা আমরা বুদ্ধের জীবনচরিত পাঠ করিলে জানিতে পারি। ভারতের হুঙ্কার-রবে পৃথিবী জাগ্রত হইয়া উঠে এবং সেই শব্দ শুনিয়া মানবজাতির সুষুপ্ত অবস্থা দূর হইয়া যায় এবং নূতন সত্য, নূতন রস, নূতন ভাব এবং বিশ্বাস আসিয়া পৃথিবীকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করে। আমরা সেই বুদ্ধদেবের জীবন বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম অধ্যায়।

শাক্যজাতি এবং কপিলবস্তু।

বুদ্ধের অনেকগুলি নাম ছিল। নামকরণের সময় তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ হয়। লোকে তাঁহাকে শাক্যগৌতম কিম্বা শাক্যসিংহ বলিয়া ডাকিত। তিনি সাধনে সিদ্ধ হইলে পর শাক্যমুনি এবং শাক্যবুদ্ধ নাম প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে তথাগত এবং সুগত বলিয়াও ডাকিত। শাক্যগৌতম তাঁহার জাতীয় নাম ছিল। ইহার অর্থ এই যে, তিনি শাক্যজাতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার গৌতমগোত্রে জন্ম। শাক্য কিম্বা শক কিম্বা শাকী এইরূপ নামের এক বা ততোধিক জাতির কথা আমরা মহাভারত এবং গ্রীক পুস্তকেও পাঠ করিয়া থাকি। এই তিনটি এক বা স্বতন্ত্র জাতি ইহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে শাক্যদিগের কতকগুলি আচার ব্যবহারের বিষয় পড়িলে বোধ হয়, যে তাহারা ভারতের বহির্ভূত কোন দেশ হইতে আসিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। আর যদি মহাভারতে উল্লিখিত শক জাতি শাক্য জাতি হয়, তাহা হইলে এপ্রকার জাতি অনেককাল হইতে এদেশে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং তাহাদিগের উৎপত্তি নির্ণয় করিবার জন্য বিদেশে যাইবার প্রয়োজন নাই।

শাক্যেরা সূর্য্যবংশোদ্ভূত এবং তাহাদিগেরও পূর্ব্বপুরুষের নাম ইক্ষ্বাকু। এই জাতি অনেক দিন ধরিয়া সিন্ধুদেশে পটল নামক স্থানে রাজত্ব করিত। পরে তাহাদিগের মধ্যে একজন কাশীর অধিপতি হন। তাঁহার নাম অশ্ব। অশ্বের পাঁচজন মহিষী ছিল, যথা—হস্তা, চিত্রা, জন্তু, জালিনী এবং বিশাখা।

হস্তার চারি পুত্র এবং পাঁচ কন্যা ছিল। যখন হস্তার কাল হয়, তখন অশ্ব আর একটি দারপরিগ্রহ করেন। এই বিবাহে তাঁহার একটি সন্তান হয়। যখন এই সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন তাহার মাতা রাজাকে এই অঙ্গীকার করাইয়া লয়েন যে, তাঁহার সমুদয় রাজ্য এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সেই সন্তান হইবে। অশ্ব আর কিছু করিতে না পারিয়া তাঁহার চারি সন্তানকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তোমাদিগের প্রাপ্য রাজ্য আমি আর একজনকে দিয়াছি। আমি এই কার্য্য স্ত্রীলোকের মোহে পড়িয়া করিয়াছি। তোমরা আর এখানে থাকিও না। তোমাদিগকে যথেষ্ট ধন জন দিতেছি—তাহা লইয়া তোমরা আর একটি নগর প্রতিষ্ঠা কর।" পুত্রেরা যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় তাহাদিগের ভগিনীরা মনে করিল—আমরা বিমাতার কাছে থাকিয়া কি করিব?" সুতরাং তাহারাও ভ্রাতৃগণের সহগামিনী হইল।' ইহা দেখিয়া নগরের সম্ভ্রান্ত লোকেরাও ভাবিল—রাজপুত্রেরা নিশ্চয় এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ্য পুনরাধিকার করিবে। আমরা সঙ্গে যাইলে ফিরিবার কালে যথেষ্ট অনুগ্রহ পাইব। তাহা হইলে আমরাও ইহাঁদিগের সমভিব্যাহারে যাই না কেন।

এইরূপে চারিজন রাজকুমার পাঁচ ভগ্নী এবং অসংখ্য অনুচর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কাশীর বাহিরে এক নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই বনের প্রান্তে এক হ্রদ ছিল এবং সেই হ্রদের একপার্শ্বে কপিলমুনির আশ্রম ছিল। তাঁহারা সেই মুনির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কপিলমুনি তাঁহাদিগের ইতিহাস আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"তোমরা এইখানে থাকিয়াই একটি নগর স্থাপন কর। আমার ইচ্ছা যে, এই আশ্রম যে স্থানে নির্ম্মিত, ঠিক তাহারই উপর নবনগরের প্রতিষ্ঠা হয়। আমার ইচ্ছামত

কার্য্য করিলে তোমাদিগের রাজধানী জগদ্বিখ্যাত হইবে। দেখ, এই বনের পশুরা হিংস্রক হইয়াও হিংসা করে না। ব্যাঘ্র হরিণ এখানে কুশলে নিবাস করে। সুতরাং তোমরাও এখানে অবস্থিতি করিলে তোমাদিগের নগরও শান্তিপ্রিয় হইবে।” রাজকুমারেরা মহা উল্লাসের সহিত নগরনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শেষে নগর নির্ম্মিত হইলে তাহার নাম কপিলবস্তু রাখিলেন। তাঁহারাও কপিলের শিষ্য হইলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই মুনি প্রসিদ্ধ সাংখ্যপ্রণেতা কপিল কি না? যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম যে সাংখ্যদর্শনের অনুমোদিত একথা অক্লেশে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদি বুদ্ধের পূর্ব্বপুরুষেরা কপিলের শিষ্য ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সাংখ্যমত শাক্যজাতির রক্তস্রোত দিয়া চলিয়া আসিতেছে একথা অত্যুক্তি নহে। স্বভাবতঃ বুদ্ধ সেই মতের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন একথাও বলা যাইতে পারে।

অশ্রুজল।

(চিত্রদর্শনে)

১

তুষার উপরে বুকটি চাপিয়া
বালিকা কাঁদিছে জ্বলে’,
দু’টি আঁখি হ’তে ঝরে অশ্রুবারি
প্রণয় ভেঙ্গেছে বলে’।

২

পৌষরজনী, শিহরে অধর
    শীর্ণ শিশির পরে ;
শাদা মুখখানি ঝক্ ঝক্ করে
    স্তব্ধ চাঁদের করে।

৩

যে প্রণয়ভরে সঁপেছে পরাণ
    যাহার চরণতলে,
এত কে নিঠুর ? ভেঙ্গেছে যে মন
    প্রণয় সুখের ছলে।

৪

ভাঙ্গিলে হৃদয় গড়িতে পারে না
    শীতের চাঁদিমা রাতে ;
বসন্ত এ নয়—মলয় বহিয়ে
    ফিরাবে আরেক পথে।

৫

জীবনের সখা হারালে যৌবনে
    এমনি অদৃষ্ট ওর ;
বরফের পরে বুক পাতি' তাই
    করিছে তপস্যা ঘোর।

৬

ঝরিছে ঝরুক—ওই অশ্রুধারে
    শ্যামল হইবে ধরা,
শীতের তুষারে দেখ সবে চেয়ে
    কোমল কুসুমঝরা !

রীতিমত নভেল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আল্লা হো আকবর্" শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিন লক্ষ যবন সেনা, অন্যদিকে তিন সহস্র আর্য্য সৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বত্থ বৃক্ষের মত হিন্দুবীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেই সঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে, এবং আজিকার ঐ অস্তাচলবর্ত্তী সহস্ররশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইবে।

হর হর বোম্ বোম্! পাঠক, বলিতে পার, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশ জন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল! বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবন সৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল! কাহার বজ্রমন্দ্রিত "হর হর বোম্ বোম্" শব্দে তিন লক্ষ ম্লেচ্ছকণ্ঠের "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল, কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেষযূথের ন্যায় শত্রুসৈন্য মুহূর্ত্তের মধ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইল!—বলিতে পার, সেদিনকার আর্য্যস্থানের সূর্য্যদেব সহস্র রক্তকরস্পর্শে কাহার রক্তাক্ত তরবারীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন! বলিতে পার কি পাঠক?

ইনিই সেই ললিত সিংহ। কাঞ্চীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্রুব নক্ষত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ কাঞ্চীনগরে কিসের এত উৎসব? পাঠক জান কি? হর্ম্ম্যশিখরে জয়ধ্বজা কেন এত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে? কেবল কি বায়ুভরে, না আনন্দভরে? দ্বারে দ্বারে কদলীতরু ও মঙ্গল ঘট, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, পথে পথে দীপমালা। পুরপ্রাচীরের উপর লোকে লোকারণ্য। নগরের লোক কাহার জন্য এমন উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা পুরুষকণ্ঠের জয়ধ্বনি এবং বামাকণ্ঠের হুলুধ্বনি একত্র মিশ্রিত হইয়া অভ্রভেদ করিয়া অনিমেষ নক্ষত্রলোকের দিকে উত্থিত হইল। নক্ষত্রশ্রেণী বায়ুব্যাহত দীপমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। ঐ যে প্রমত্ত তুরঙ্গমের উপর আরোহণ করিয়া বীরবর পুরদ্বারে প্রবেশ করিতেছেন, উঁহাকে চিনিয়াছ কি? উনিই আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত ললিত সিংহ, কাঞ্চীর সেনাপতি। শত্রু নিধন করিয়া স্বীয় প্রভু কাঞ্চীরাজপদতলে শত্রুরক্তাঙ্কিত খড়্গ উপহার দিতে আসিয়াছেন। তাই এত উৎসব।

কিন্তু এত যে জয়ধ্বনি, সেনাপতির সে দিকে কর্ণপাত নাই, গবাক্ষ হইতে পুরললনাগণ এত যে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন সেদিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। অরণ্যপথ দিয়া যখন তৃষ্ণাতুর পথিক সরোবরের দিকে ধাবিত হয় তখন শুষ্ক পত্ররাশি তাঁহার মাথার উপর ঝরিতে থাকিলে তিনি কি ভ্রূক্ষেপ করেন? অধীরচিত্ত ললিত সিংহের নিকট এই অজস্র সম্মান সেই শুষ্ক পত্রের ন্যায় নীরস, লঘু ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে

অশ্ব যখন অন্তঃপুরপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য সেনাপতি তাহার বল্গা আকর্ষণ করিলেন, অশ্ব মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইল, মুহূর্ত্তের জন্য ললিত সিংহ একবার প্রাসাদবাতায়নে তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইলেন, দুইটি লজ্জানত নেত্র একবার চকিতের মত তাঁহার মুখের উপর পড়িল এবং দুইটি অনিন্দিত বাহু হইতে একটি পুষ্পমালা খসিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে নামিয়া সেই মালা কিরীটচূড়ায় তুলিয়া লইলেন এবং আর একবার কৃতার্থ দৃষ্টিতে উর্দ্ধে চাহিলেন। তখন দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দীপ নির্ব্বাপিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সহস্র শত্রুর নিকট যে অবিচলিত, দুইটি চকিত হরিণনেত্রের নিকট সে পরাভূত। সেনাপতি বহুকাল ধৈর্য্যকে পাষাণদুর্গের মত হৃদয়ে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, গতকল্য সন্ধ্যাকালে দুটি কালো চোখের সলজ্জ সসম্ভ্রম দৃষ্টি সেই দুর্গের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং এতকালের ধৈর্য্য মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়া গেছে! কিন্তু ছিছি সেনাপতি, তাই বলিয়া কি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মত রাজান্তঃপুরের উদ্যান-প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হয়! তুমিই না ভুবনবিজয়ী বীরপুরুষ!

কিন্তু যে উপন্যাস লেখে, তাহার কোথাও বাধা নাই; দ্বারীরাও দ্বাররোধ করে না, অসূর্য্যম্পশ্যারূপা রমণীরাও আপত্তি প্রকাশ করে না। অতএব, এই সুরম্য বসন্তসন্ধ্যায় দক্ষিণবায়ুবীজিত রাজান্তঃপুরের নিভৃত উদ্যানে একবার প্রবেশ করা যাক্—হে পাঠিকা, তোমরাও আইস, এবং পাঠকগণ, ইচ্ছা

করিলে তোমরাও অনুবর্ত্তী হইতে পার আমি অভয়দান করিতেছি।

একবার চাহিয়া দেখ, বকুলতলে তৃণশয্যায় সন্ধ্যাতারার প্রতিমার মত ঐ রমণী কে? হে পাঠক, হে পাঠিকা তোমরা উঁহাকে জান কি? অমন রূপ কোথাও দেখিয়াছ? রূপের কি কখন বর্ণনা করা যায়? ভাষা কি কখনও কোন মন্ত্রবলে এমন জীবন, যৌবন এবং লাবণ্যে ভরিয়া উঠিতে পারে! হে পাঠক, তোমার যদি দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় তবে স্ত্রীর মুখ স্মরণ কর! হে রূপসি পাঠিকা, যে যুবতীকে দেখিয়া তুমি সঙ্গিনীকে বলিয়াছ "ইহাকে কি এমন ভাল দেখিতে ভাই! হোক্ সুন্দরী, কিন্তু ভাই তেমন শ্রী নাই" তাহার মুখ মনে কর, ঐ তরুতলবর্ত্তিনী রাজকুমারীর সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবে। পাঠক এবং পাঠিকা, এবার চিনিলে কি? উনিই রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা।

রাজকুমারী কোলের উপর ফুল রাখিয়া নতমুখে মালা গাঁথিতেছেন, সহচরী কেহই নাই। গাঁথিতে গাঁথিতে এক একবার অঙ্গুলি আপনার সুকুমার কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছে, উদাসীন দৃষ্টি কোন্ এক অতিদূরবর্ত্তী চিন্তারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী কি ভাবিতেছেন? কিন্তু হে পাঠক, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। কুমারীর নিভৃত হৃদয়মন্দিরের মধ্যে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কোন্ মর্ত্ত্যদেবতার আরতি হইতেছে, অপবিত্র কৌতূহল লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না। ঐ দেখ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পূজার সুগন্ধি ধূপধূমের ন্যায় সন্ধ্যার বাতাসে মিশাইয়া গেল, এবং দুই ফোঁটা অশ্রুজল দুটি কোমল পুষ্পকোরকের মত অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে খসিয়া পড়িল।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে একটি পুরুষের কণ্ঠ গভীর আবেগ-ভরে কম্পিত রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল "রাজকুমারি!" রাজকন্যা সহসা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চারিদিক হইতে প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া অপরাধীকে বন্দী করিল। রাজকন্যা তখন পুনরায় সসংজ্ঞ হইয়া দেখিলেন সেনাপতি বন্দী হইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এ অপরাধে প্রাণদণ্ডই বিধান। কিন্তু পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। সেনাপতি মনে মনে কহিলেন "দেবি, তোমার নেত্রও যখন প্রতারণা করিতে পারে, তখন সত্য পৃথিবীতে কোথাও নাই। আজ হইতে আমি মানবের শত্রু।" একটি বৃহৎ দস্যুদলের অধিপতি হইয়া ললিত সিংহ অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

হে পাঠক, তোমার আমার মত লোক এরূপ ঘটনায় কি করিত? নিশ্চয়, যেখানে নির্ব্বাসিত হইত সেখানে আর একটা চাকরীর চেষ্টা দেখিত, কিম্বা একটা নূতন খবরের কাগজ বাহির করিত। কিছু কষ্ট হইত সন্দেহ নাই—সে অন্নাভাবে। কিন্তু সেনাপতির মত মহৎলোক, যাহারা উপন্যাসে সুলভ এবং পৃথিবীতে দুর্লভ, তাহারা চাকরীও করে না, খবরের কাগজও চালায় না। তাহারা যখন সুখে থাকে তখন এক নিঃশ্বাসে নিখিল জগতের উপকার করে, এবং মনোবাঞ্ছা তিলমাত্র ব্যর্থ হইলেই আরক্তলোচনে বলে, "রাক্ষসী পৃথিবী, পিশাচ সমাজ, তোদের বুকে পা দিয়া আমি ইহার প্রতিশোধ লইব" বলিয়া তৎক্ষণাৎ দস্যুব্যবসায় আরম্ভ করে; এইরূপ ইংরাজিকাব্যে পড়া যায় এবং অবশ্যই এ প্রথা রাজপুতদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

দস্যুর উপদ্রবে দেশের লোক ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অসামান্য দস্যুরা অনাথের সহায়, দরিদ্রের বন্ধু, দুর্ব্বলের পক্ষ, কেবল ধনী, উচ্চকুলজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজকর্ম্মচারীদের পক্ষে কালান্তক যম।

ঘোর অরণ্য। সূর্য্য অস্তপ্রায়। কিন্তু বনচ্ছায়ায় অকাল রাত্রির আবির্ভাব হইয়াছে। তরুণ যুবক অপরিচিত পথে একাকী চলিতেছে। সুকুমার শরীর পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু তথাপি অধ্যবসায়ের বিরাম নাই। কটিদেশে যে তরবারী বদ্ধ রহিয়াছে তাহারই ভার দুঃসহ বোধ হইতেছে। অরণ্যে লেশমাত্র শব্দ হইলেই ভয়প্রবণ হৃদয় হরিণের মত চকিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি এই আসন্ন রাত্রি এবং অজ্ঞাত অরণ্যের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দস্যুরা আসিয়া দস্যুপতিকে সংবাদ দিল, "মহারাজ, বৃহৎ শীকার মিলিয়াছে। মাথায় মুকুট, রাজবেশ, কটিদেশে তরবারী।" দস্যুপতি কহিলেন "তবে এ শীকার আমার। তোরা এখানেই থাক্!"

পথিক চলিতে চলিতে সহসা একবার শুষ্ক পত্রের খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সহসা বুকের মাঝখানে তীর আসিয়া বিঁধিল, পান্থ "মা" বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দস্যুপতি নিকটে আসিয়া জানু পাতিয়া নত হইয়া আহতের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভূতলশায়ী পথিক দস্যুর হাত ধরিয়া কেবল একবার মৃদুস্বরে কহিল "ললিত!"

মুহূর্ত্তে দস্যুর হৃদয় যেন সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া এক চীৎকার শব্দ বাহির হইল "রাজকুমারী!"

দস্যুরা আসিয়া দেখিল শীকার এবং শিকারী উভয়েই অন্তিম আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে।

রাজকুমারী একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার অন্তঃপুরের উদ্যানে অজ্ঞানে ললিতের উপর রাজদণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ললিত আর একদিন সন্ধ্যাকালে অরণ্যের মধ্যে অজ্ঞানে রাজকন্যার প্রতি শরনিক্ষেপ করিল। সংসারের বাহিরে যদি কোথাও মিলন হইয়া থাকে ত আজ উভয়ের অপরাধ উভয়ে বোধ করি মার্জ্জনা করিয়াছে।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। মেঘনাদবধচিত্র। বহুকাল হইল প্রথম বর্ষের ভারতীতে মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনার বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন।—রিজ্‌লি সাহেবের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদচন্দ্র বাবু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি নামক যে প্রবন্ধ সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে, ভারতবর্ষের অনার্য্যজাতীয়েরা কি করিয়া ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডীর মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়— প্রবন্ধটি নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আমরা যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ

করিলাম না।—সাকার ও নিরাকার উপাসনা। ইহাতে যে সকল তর্ক অবলম্বিত হইয়াছে তাহা এতই সরল, যে, সহসা মনে প্রশ্ন উদয় হয় এ সকল কথা কি কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝানো আবশ্যক? দুঃখের বিষয় এই যে, আবশ্যক আছে। আরো দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা মনে মনে এ সমস্তই বুঝেন, তাঁহারাও নানারূপ কৃত্রিম কূট তর্ক উদ্ভাবন করিতেছেন, সুতরাং এ যুক্তিগুলি স্থলবিশেষে ভুল ভাঙ্গিবার এবং স্থলবিশেষে কেবলমাত্র মুখবন্ধ করিবার জন্য আবশ্যক হইয়াছে।—**অনাহারে মরণ।** **বাল্যকাল হইতে যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার পায় না** বলিয়া যে বাঙ্গালী জাতির মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে এ কথা আমরা লেখকের সহিত স্বীকার করি। শরীর অপুষ্ট থাকাতে আমাদের চরিত্রের ভিত্তি কাঁচা থাকিয়া যায়। লেখকের মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কেবল তাঁহার রচনার দুই এক স্থলে আমাদের খট্‌কা লাগিয়াছে। এক স্থলে আছে "তাঁহারা বাক্যসার বক্তাদিগের অপেক্ষা ভাল স্বদেশপ্রেমিক "better patriots"।" ইংরাজি কথাটা জুড়িয়া দিবার অত্যাবশ্যক কারণ বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধের উপসংহারে গদ্য সহসা বিনা নোটিসে একপ্রকার ভাঙ্গাছন্দ পদ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। সেই জন্য এই আড়ম্বরহীন গম্ভীর প্রবন্ধ শেষকালটায় হঠাৎ এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে; সংযতবেশ ভদ্রলোক সভাস্থলে অকস্মাৎ নটের ভাব ধারণ করিলে যেমন হয় সেইরূপ। শেষ অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা স্বতন্ত্র পদ্য রচনা করিলে এরূপ খাপছাড়া হইত না।

সাহিত্য। শ্রাবণ। মধুচ্ছন্দার সোমযাগ। বেদে যে সোমযাগের উল্লেখ আছে এই অতি উপাদেয় প্রবন্ধে তাহারই

আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় বলেন বৈদিক ঋষিদের মধ্যে "মধুবিদ্যা" নামক একটি গোপনীয় বিদ্যা ছিল। সেই বিদ্যার রহস্য যে জ্ঞানীরা অবগত ছিলেন তাঁহাদের নিকট মধু অর্থাৎ সোম অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ। লেখক বলিতেছেন, "ঋগ্বেদের প্রথমেই মধুচ্ছন্দা নামক এক ঋষির কয়েকটি মন্ত্র আছে সেই মন্ত্রগুলির আদ্যন্ত আলোচনা করিলে, মধুচ্ছন্দার সোমযাগ কিরূপ ছিল, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।" এবার-কার সংখ্যায়, মধুচ্ছন্দা ঋষি কে, তাহারই আলোচনা হইয়াছে। সোমযাগ কি তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল রহিল। উপাধি-উৎপাত প্রবন্ধে লেখক মনের আক্ষেপ তেজের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের আত্মসম্মান আপনাতেই পর্য্যাপ্ত, যাঁহারা রাজসম্মান চাহেন না, এমন কি, প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের মত মানী লোক জগতে সর্ব্বত্রই দুর্লভ। কিন্তু সাধারণতঃ যাঁহারা রাজোপাধি লাভ করিয়া গৌরব অনুভব করেন তাঁহারা কি এতই তীব্র আক্রমণের যোগ্য! তাঁহাদের মধ্যে কি দেশের অনেক যথার্থ সারবান্ যোগ্য লোক নাই? উপাধি যদি স্থল-বিশেষে অযোগ্য পাত্রে বর্ষিত হয় তবে সে রাজার দোষ—কিন্তু যাঁহারা রাজসম্মানের চিহ্নস্বরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ-লাভ করেন তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কেবল রাজাদর কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় জনাদরও অনেক সময় যোগ্যপাত্রকে উপেক্ষা করিয়া অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হয়, তাই বলিয়া জনাদর যে নিতান্তই অবজ্ঞার সামগ্রী তাহা বলিতে পারি না। সম্মান, আদর মনুষ্যের নিকট চিরকাল প্রিয়, মানুষের এ দুর্ব্বলতার জন্য স্থলবিশেষে ঈষৎ হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে কিন্তু এতটা তর্জন কিছু যেন বেশি হইয়াছে বলিয়া মনে

হয়। বিশেষতঃ, বঙ্কিমবাবু গবর্মেণ্টের হস্ত হইতে রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বঙ্কিম বাবু বঙ্গদেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই—তিনি গবর্মেণ্টের পুরাতন কর্ম্মচারী—তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেণ্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানচিহ্ন দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিম বাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে—তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর—তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মানুগত—অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি লওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিম বাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভাল হইয়াছে সন্দেহ নাই। বন্ধু গল্পটির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের স্নিগ্ধ শ্রাবণ মাস বেশ একটি সঙ্গীত-মিশ্রিত সৌন্দর্য্য নিক্ষেপ করিয়াছে।—আদর্শ সমালোচনা। বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্ত্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদের নাই। অতএব "আদর্শ-সমালোচনা"-লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সে জন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হই

নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখকের নিপুণতার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে পারি যে, তিনি যদি রসিকতা প্রকাশের নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন ত হয় ত কৃতকার্য্য হইতেও পারেন। কালিদাস ও সেক্ষপিয়র লেখার মধ্যে যথেষ্ট চিন্তাশীলতা আছে, আমরা ইহার পরিণামের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আমার "স্বরচিত" লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সাহিত্যেই লিখিয়া পাঠাইয়াছি। এখানে কেবল সংক্ষেপে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ক্ষুদ্র অনুরাগ বৃহৎ অনুরাগে পরিণত হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ কি করিয়া নিরনুরাগে লইয়া যাইবে আমরা বুঝিতে পারি না। চন্দ্রনাথ বাবু তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, ছোট অনুরাগ যখন স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত প্রকৃতির বড় অনুরাগে পরিণত হইতেছে তখন বড় অনুরাগ নিরনুরাগে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এক শক্তি ভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়াই শক্তির ধ্বংশ হওয়া আশ্চর্য্য নহে এরূপ যুক্তি আমরা প্রত্যাশা করি নাই। দেখিতেছি আমাদের আলোচনা ক্রমশঃ কথাকাটাকাটিতে পরিণত হইতেছে, অতএব এ আলোচনা এইখানেই লয় প্রাপ্ত হইলে মন্দ হয় না।

স্বরলিপি।*

তুমি কি লো তোমারি তরে
—শুধু তোমারি তরে,
ফুটিয়ে উঠেছ,
আছ গরব-ভরে?
বাসে আপনি বিভোর,
চথে ঘন ঘুম-ঘোর,
ফিরে চাহিতে চাহনা যেন
অমর-নরে!

৪|২

।২´।৩।০।১।

২´ ॥ ৩ ০
না না॥ র্সা র্সা না র্সর্রা। র্সা ঞ্জা ধা -া। না না না র্সর্রা।
তু মি॥ কি লো তো মা। রি ত রে —। শু ধু তো মা।

১
। র্সা ঞ্জা ধা -া। পা পা মা মা। গা রা পা পা।
। রি ত রে —। ফু টি য়ে উ। ঠে ছ আ ছ।

। মা গা মা রা। সা -া না না॥ মা গা। মা মা ধা না।
। গ র ব ভ। রে — (তু মি)॥ বা সে। আ প নি বি।

। র্সা -া না র্সা। র্গা র্গা র্রা না। র্সা -া র্সা না।
। ভো র্ চো খে। ঘ ন ঘু ম। ঘো র্ ফি রে।

---

* "সাধনার" জনৈক গ্রাহক শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গানের স্বর-লিপি পাঠাইয়াছেন।

। র্সা র্গা র্মা র্পা। র্মা র্গা র্রা র্সা। না র্সর্রা র্সা ধ্না।
। চা হি তে চা। হ না যে ন। অ ম র ন।

। ধা -া না না ॥
। রে — (তু মি) ॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। কলির শেষে যেখানে যুগল ছেদ দেখিবে সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া আস্থায়ীর আরম্ভের যুগল ছেদের পর হইতে পুনরাবৃত্তি করিবে। অর্থাৎ আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া "তুমি" ছাড়িয়া একেবারে "কি লো" হইতে ধরিবে। এবং "কি লো" এইটুকুমাত্র গাহিয়া আবার অন্তরা ধরিবে; তাই, "কি লো" র পরে শিরোদেশে যুগল-ছেদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

২। এক ছেদ হইতে ছেদান্তর পর্য্যন্ত সুরগুলি এক পদের অর্থাৎ এক তাল-বিভাগের অন্তর্গত। এই প্রতি পদ-বিভাগের প্রথম সুরের উপর তালি কিম্বা ফাঁক পড়ে। কাওয়ালি তালে তিন তালি, এক ফাঁক। ১, ২´, ৩ এই তিন তালির চিহ্ন ও ০ ফাঁকের চিহ্ন। যে সংখ্যার উপর রেফ্ থাকে সেইটি সম। কাওয়ালি তালে দ্বিতীয় তালিতেই সম পড়ে। এই গানের আরম্ভ সম হইতে।

———

সাধনা।

জয় পরাজয়।

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখন চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু যেদিন কোন নূতন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন, সেদিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন, যাহাতে তাহা সেই সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের জালায়নবর্ত্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোন এক অগম্য নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে আপনার সঙ্গীতোচ্ছ্বাস প্রেরণ করিতেন, যেখানে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জীবনের একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখন ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখন নূপুরশিঞ্জনের মতন শুনা যাইত; বসিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেন, সে কেমন দুইখানি চরণ যাহাতে সেই সোণার নূপুর বাঁধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে! সেই দুইখানি রক্তিম শুভ্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কি সৌভাগ্য কি অনুগ্রহ কি করুণার মত করিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণ দুটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং সেই নূপুরশিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু যে ছায়া দেখিয়াছিল, যে নূপুর শুনিয়াছিল, সে কাহার ছায়া কাহার নূপুর এমন তর্ক এমন সংশয় তাহার ভক্তহৃদয়ে কখন উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরী যখন ঘাটে যাইত, শেখরের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সঙ্গে তাহার দুটা কথা না হইয়া যাইত না। তেমন নির্জ্জন দেখিলে সে সকালে সন্ধ্যায় শেখরের ঘরের মধ্যে গিয়াও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত ততবার যে তাহার আবশ্যক ছিল এমনও বোধ হইত না, যদি বা আবশ্যক ছিল এমন হয়, কিন্তু ঘাটে যাইবার সময় উহারই মধ্যে একটু বিশেষ যত্ন করিয়া একটা রঙীন্ কাপড় এবং কানে দুইটা আম্রমুকুল পরিবার কোন উচিত কারণ পাওয়া যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কানাকানি করিত। লোকের কোন অপরাধ ছিল না। মঞ্জরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না। তাহার নাম ছিল মঞ্জরী; বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু শেখর আবার আরও একটু কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসন্তমঞ্জরী বলিতেন। লোকে শুনিয়া বলিত,আ সর্ব্বনাশ! আবার কবির বসন্ত-বর্ণনার মধ্যে—"মঞ্জুল বঞ্জুল মঞ্জরী" এমনতর অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এমন কি, জনরব রাজার কানেও উঠিয়াছিল। রাজা তাঁহার কবির এইরূপ রসাধিক্যের পরিচয় পাইয়া বড়ই আমোদ বোধ করিতেন—তাহা লইয়া কৌতুক করিতেন, শেখরও তাহাতে যোগ দিতেন। রাজা হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, "ভ্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভায় গান গায়"—কবি উত্তর দিতেন, "না, পুষ্পমঞ্জরীর মধুও খাইয়া থাকে।"

এমনি করিয়া সকলেই হাসিত, আমোদ করিত; বোধ করি অন্তঃপুরে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিবেন। মঞ্জরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন এক-রকম করিয়া কাটিয়া যায়—খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়; জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া; প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ—সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল—এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই অমনি দেশের চতুর্দ্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শুনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত, এবং অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে কখন কখন একটা ছায়া পড়িত, কখন কখন একটা নূপুর শুনা যাইত।

২

এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে এক দিগ্বিজয়ী কবি শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া

দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন "এহি, এহি!" কবি পুণ্ডরীক দম্ভভরে কহিলেন "যুদ্ধং দেহি।"

রাজার মান রাখিতে হইবে—যুদ্ধ দিতে হইবে, কিন্তু কাব্য-যুদ্ধ যে কিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালরূপ ধারণা ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশস্বী পুণ্ডরীকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ বক্রনাসা এবং দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক দিগ্বিদিকে অঙ্কিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহৃদয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রত্যুষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে, কলরবের সীমা নাই; নগরে আর সমস্ত কাজকর্ম্ম একেবারে বন্ধ। কবি শেখর বহুকষ্টে মুখে সহাস্য প্রফুল্লতার আয়োজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কবি পুণ্ডরীককে নমস্কার করিলেন—পুণ্ডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিতান্ত ইঙ্গিতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনুবর্ত্তী ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। শেখর একবার অন্তঃপুরের জালায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারিলেন সেখান হইতে আজ শত শত কৌতূহলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার ব্যগ্রদৃষ্টি এই জনতার উপরে অজস্র নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই ঊর্দ্ধলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন, মনে মনে কহিলেন "আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবি, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারি নামের সার্থকতা হইবে।"

তূরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। শুক্লবসন রাজা উদয়নারায়ণ শরৎপ্রভাতের শুভ্র মেঘরাশির ন্যায় ধীরগমনে সভায় প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

পুণ্ডরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃহৎ সভা স্তব্ধ হইয়া গেল।

বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া গ্রীবা ঈষৎ ঊর্দ্ধে হেলাইয়া বিরাট-মূর্ত্তি পুণ্ডরীক গম্ভীরস্বরে উদয়নারায়ণের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠস্বর ঘরে ধরে না—বৃহৎ সভাগৃহের চারিদিকের ভিত্তিতে স্তম্ভে ছাদে সমুদ্রের তরঙ্গের মত গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই ধ্বনির বেগে সমস্ত জনমণ্ডলীর বক্ষকবাট থর্ থর্ করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কত কৌশল, কত কারুকার্য্য, উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা, রাজার নামাক্ষরের কতদিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক! পুণ্ডরীক যখন শেষ করিয়া বসিলেন, কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ সভাগৃহ তাঁহার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ও সহস্র হৃদয়ের নির্ব্বাক্ বিস্ময়রাশিতে গম্ গম্ করিতে লাগিল। বহুদূর দেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সাধু সাধু করিয়া উঠিলেন।

তখন সিংহাসন হইতে রাজা একবার শেখরের মুখের দিকে চাহিলেন। শেখরও ভক্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সকরুণ সঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম যখন লোকরঞ্জনার্থে দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সীতা যেন এইরূপ ভাবে চাহিয়া এম্‌নি করিয়া তাঁহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে

দাঁড়াইয়াছিলেন। কবির দৃষ্টি নীরবে রাজাকে জানাইল—"আমি তোমারই! তুমি যদি বিশ্বসমক্ষে আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিতে চাও ত কর। কিন্তু—" তাহার পরে নয়ন নত করিলেন। পুণ্ডরীক সিংহের মত দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারিদিকে ব্যাধবেষ্টিত হরিণের মত দাঁড়াইল। তরুণ যুবক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহ-কোমল মুখ, পাণ্ডুবর্ণ কপোলে, শরীরাংশ নিতান্ত স্বল্প, দেখিলে মনে হয় ভাবের স্পর্শমাত্রেই সমস্ত দেহ যেন বীণার তারের মত কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মুখ না তুলিয়াই প্রথমে অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন। প্রথম একটা শ্লোক বোধ হয় কেহ ভাল করিয়া শুনিতে পাইল না। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিলেন—যেখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমস্ত জনতা এবং রাজসভার পাষাণ-প্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদূরবর্ত্তী অতীতের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুমিষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্রবংশীয় আদিপুরুষের কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুদ্ধ বিগ্রহ শৌর্য্য বীর্য্য যজ্ঞ দান কত মহদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্ত্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দূরস্মৃতিবদ্ধ দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহৃদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে মূর্ত্তিমান্ করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিলেন—যেন দূর দূরান্তর হইতে শত সহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া রাজপিতামহদিগের এই অতি পুরাতন প্রাসাদকে মহাসঙ্গীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল—ইহার প্রত্যেক ইষ্টককে যেন তাহারা স্পর্শ

করিল, আলিঙ্গন করিল, চুম্বন করিল, উর্দ্ধে অন্তঃপুরের জালায়ন সম্মুখে উত্থিত হইয়া রাজলক্ষ্মী-স্বরূপা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে স্নেহার্দ্র ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহোল্লাসে শত শতবার করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন, মহারাজ, বাক্যেতে হার মানিতে পারি কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে! এই বলিয়া কম্পিতদেহে বসিয়া পড়িলেন। তখন অশ্রুজলে অভিষিক্ত প্রজাগণ জয় জয় রবে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমণ্ডলীর এই উন্মত্ততাকে ধিক্কারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃপ্তগর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে! সকলে এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি নানা ছন্দে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন—বিশ্বের মধ্যে বাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাক্যই সত্য, বাক্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাক্যের বশ—অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়। ব্রহ্মা চারিমুখে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না—পঞ্চানন পাঁচমুখে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খুঁজিতেছেন। এম্‌নি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভ্রভেদী সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্ত্যলোক এবং সুরলোকের মস্তকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার বজ্রনিনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে? দর্পভরে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন; যখন কেহ কোন উত্তর দিল না তখন ধীরে ধীরে আসন

গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতগণ সাধু সাধু ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—রাজা বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপুল পাণ্ডিত্যের নিকটে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। আজিকার মত সভাভঙ্গ হইল।

৩

পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন ;—বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে, তখনও গোপিনীরা জানে না, কে বাজাইল—জানে না, কোথায় বাজিতেছে। একবার মনে হইল, দক্ষিণ পবনে বাজিতেছে, একবার মনে হইল উত্তরে গিরি-গোবর্দ্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে ; মনে হইল উদয়াচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে ; মনে হইল অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে ; মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল, মনে হইল আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র—অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্ব্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল—বাঁশি কি বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না, এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কি বলিতে চাহে তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না ; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল, এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উতলা হইয়া উঠিল।

সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ অপযশ, জয় পরাজয়, উত্তর প্রত্যুত্তর, সমস্ত ভুলিয়া শেখর আপনার নির্জ্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ম্ময়ী

আমসী মূর্ত্তি, কেবল কানে বাজিতেছিল দুটি কমল-চরণের নূপুর-ধ্বনি। কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলেন, তখন একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে একটি বৃহৎ ব্যাপ্ত বিরহ ব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কেহ সাধুবাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পুণ্ডরীক সিংহাসন সম্মুখে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন—রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?—বলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?" বলিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য বিস্তার করিয়া আপনিই তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন রাধা প্রণব, ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যান যোগ এবং বৃন্দাবন দুই ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী বিন্দু। ইড়া, সুষুম্না, পিঙ্গলা, নাভিপদ্ম, হৃৎপদ্ম, ব্রহ্মরন্ধ্র সমস্ত আনিয়া ফেলিলেন। রা অর্থেই বা কি ধা অর্থেই বা কি, কৃষ্ণ শব্দের ক হইতে মূর্দ্ধণ্য ণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে তাহার একে একে মীমাংসা করিলেন। একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ যজ্ঞ, রাধিকা অগ্নি, একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ বেদ এবং রাধিকা ষড়দর্শন, তাহার পরে বুঝাইলেন কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা; রাধিকা উত্তর প্রত্যুত্তর, কৃষ্ণ জয়লাভ। এই বলিয়া রাজার দিকে পণ্ডিতদের দিকে এবং অবশেষে তীব্র হাস্যে শেখরের দিকে চাহিয়া পুণ্ডরীক বসিলেন। রাজা পুণ্ডরীকের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এবং কৃষ্ণ রাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশীর গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল;

যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে একজন বসন্তের সবুজ রংটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল। শেখর আপনার এতদিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন, ইহার পরে তাঁহার আর গান গাহিবার সামর্থ্য রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইল।

৪।

পরদিন পুণ্ডরীক ব্যস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যস্ত এবং দ্বিসমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্ষ্য, সৌত্র, চক্র, পদ্ম, কাকপদ, আদ্যুত্তর, মধ্যোত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর, শ্লোকোত্তর, বচনগুপ্ত, মাত্রাচ্যুতক, চ্যুতদত্তাক্ষর, অর্থগূঢ়, স্তুতিনিন্দা, অপহ্নুতি, শুদ্ধাপভ্রংশ, শাব্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শুনিয়া সভাসুদ্ধ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না। শেখর যে সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল—তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিত—আজ তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহাতে কোন গুণপনা নাই, যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত, কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না—নহিলে কথাগুলো বিশেষ নূতনও নহে, দুরূহও নহে, তাহাতে পৃথিবীর লোকের নূতন একটা শিক্ষাও হয় না, সুবিধাও হয় না—কিন্তু আজ যাহা শুনিল তাহা অদ্ভুত ব্যাপার; কাল যাহা শুনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের নিকট তাহাদের আপনার কবিটিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত

অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী সভাস্থজনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।

আজ শেষদিন। আজ জয় পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাঁহার কবির প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই, আজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলে চলিবে না—তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। শেখর শ্রান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই ক'টি কথা বলিলেন—"বীণাপাণি, শ্বেতভুজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী, তাহাদের কি গতি হইবে?" মুখ ঈষৎ উপরে তুলিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, যেন শ্বেতভুজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজান্তঃপুরে জালায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন পুণ্ডরীক উঠিয়া সশব্দে হাস্য করিলেন—এবং "শেখর" শব্দের শেষ দুই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গল শ্লোক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন, পদ্মবনের সহিত খরের কি সম্পর্ক? এবং সঙ্গীতের বিস্তর চর্চ্চাসত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কিরূপ ফল লাভ করিয়াছে? আর সরস্বতীর অধিষ্ঠান ত পুণ্ডরীকেই; মহারাজের অধিকারে তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন, যে, এদেশে তাঁহাকে খর-বাহন করিয়া অপমান করা হইতেছে?

পণ্ডিতেরা এই প্রত্যুত্তরে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও তাহাতে যোগ দিল—তাঁহাদের দেখা-দেখি সভাস্থদ্ধ সমস্ত লোক—যাহারা বুঝিল এবং না বুঝিল—সকলেই হাসিতে লাগিল। ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় রাজা তাঁহার কবিসখাকে বারবার অঙ্কুশের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেখর তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন রাজা শেখরের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন—এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের গলায় পরাইয়া দিলেন—সভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে এককালে অনেকগুলি বলয় কঙ্কণ নূপুরের শব্দ শুনা গেল—তাহাই শুনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৫

কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ফুলের গন্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ববন্ধুর ন্যায় মুক্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাষ্ঠমঞ্চ হইতে শেখর আপনার পুঁথিগুলি পাড়িয়া সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগুলি পৃথক্ করিয়া রাখিলেন। অনেকদিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগুলি রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার কাছে ইহা সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয়! কতকগুলা কথা এবং ছন্দ এবং মিল! ইহার মধ্যে যে, কোন সৌন্দর্য্য, মানবের কোন চির আনন্দ, কোন বিশ্বসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি, তাঁহার আপনার হৃদয়ের কোন গভীর প্রকাশ নিবদ্ধ হইয়া আছে আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগীর মুখে যেমন কোন খাদ্যই রুচে না, তেমনি আজ তাঁহার হাতের কাছে যাহা কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া

দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হৃদয়ের দুরাশা, কল্পনার কুহক—আজ অন্ধকার রাত্রে সমস্তই শূন্য বিড়ম্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। তখন একটি একটি করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িয়া সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বড় বড় রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন—আজ আমার এ কাব্যমেধ যজ্ঞ!" কিন্তু তখনি মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয় নাই। অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে তখনি অশ্বমেধ হয়—আমার কবিত্ব যে দিন পরাজিত হইয়াছে আমি সেই দিন কাব্যমেধ করিতে বসিয়াছি—আরো বহুদিন পূর্ব্বে করিলেই ভাল হইত।

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগুলিই অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। আগুন ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শূন্য হস্ত নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন—"তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম—হে সুন্দরি অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছিলে হে মোহিনী বহ্নিরূপিণি! যদি সোণা হইতাম ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবি, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।"

রাত্রি অনেক হইল। শেখর তাঁহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। তিনি যে যে ফুল ভালবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সবগুলি শাদা ফুল, যুঁই, বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মুঠা মুঠা লইয়া নির্ম্মল বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারিদিকে প্রদীপ

জ্বালাইলেন। তাহার পর মধুর সঙ্গে একটি উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমুখে পান করিলেন—এবং ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল।

নূপুর বাজিল। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগুচ্ছের একটা সুগন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল। কবি নিমীলিত নেত্রে কহিলেন "দেবি, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি? এতদিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে?" একটি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন "কবি, আসিয়াছি।" শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু মেলিলেন—দেখিলেন শয্যার সম্মুখে এক অপরূপ রমণীমূর্ত্তি। মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুলনেত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল তাঁহার হৃদয়ের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, "আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।"

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন—"রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়-মাল্য দিতে আসিয়াছি।"

বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্পমালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

বাঙ্গলার আদিকাব্য।

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-লেখকমাত্রেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডী-দাসের পরেই চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবি ও গ্রন্থকার-দিগের উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাঙ্গলা ভাষায় কোন গ্রন্থরচনা করেন নাই; ইহাঁদিগকে গীতরচক কবি বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবন দাস প্রণীত চৈতন্যভাগবতকেই অনেকে বঙ্গভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, "অনেকে জীব গোস্বামীর করচাকেই বাঙ্গালার আদিগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। * * জীব গোস্বামীর করচার পরই বোধ হয় বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যমঙ্গল লিখিত হয়।" বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের বর্ত্তমানকালে জন্মিয়াছিলেন, অনেকের মতে জীব গোস্বামী চৈতন্যের মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করেন। যাহা হউক, জীব যে বৃন্দাবনদাস অপেক্ষা অন্ততঃ ২০।২৫ বৎসর পরসাময়িক তাহা নিশ্চয়। সুতরাং বৃন্দাবনদাসকেই উক্ত সম্মানে সম্মানিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমাদের মতে ইহাঁরা কেহই সে সম্মানলাভের অধিকারী নহেন।

চৈতন্যদেবের জন্মের ১২ বৎসর পূর্ব্বে ১৩৯৫ শকে গুণরাজ খাঁন উপাধিযুক্ত মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে তাহা সমাপ্ত করিয়াছিলেন।* ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে

---

* "তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥"
শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

১৩৯৫ হইতে ১৪০১ শকাব্দ মধ্যে বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী লিখিয়াছিলেন। সুতরাং বিদ্যাপতির সমকালেই শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থকেই নিঃসংশয়ে বাঙ্গলাভাষার আদি-কাব্য বলা যাইতে পারে। মালাধর বসু বিদ্যাপতির সমকালে এই কাব্য রচনা করিলেও, তিনি বিদ্যাপতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন বোধ হয়। মালাধরের পুত্র সত্যরাজ ও তৎ-পুত্র রামানন্দ বসু চৈতন্যের সহচর ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের শ্রেষ্ঠতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কুলীন গ্রামবাসী বৈষ্ণবগণের প্রশংসাস্থলে চৈতন্য-দেব বলিয়াছেন,—

"কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোর লঞা॥
গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহে একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাহার বংশের হাত॥"

চৈতন্যচরিতামৃত.। মধ্যখণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের বাঙ্গলা অনুবাদ। গ্রন্থখানি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে নিবদ্ধ এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদের উপরে মেঘমল্লার, মল্লার, রামকেলি ইত্যাদি রাগ রাগিণীর নাম লিখিত থাকায় অনুমান হয় যে, এই কাব্য চামর মন্দিরা বা অন্য কোন সঙ্গীতযন্ত্রের সাহায্যে রাগরাগিণী সহ-যোগে গীত হইত। এই কাব্যখানি এতদিন হস্তলিখিত পুঁথির আকারে জীর্ণাবস্থায় ছিল, "সজ্জনতোষণী" সম্পাদক বাবু কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের যত্নে ১২৯২ সালে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের

সময়ে এদেশের ভাষা যে হিন্দীসংশ্রবশূন্য বাঙ্গলা ভাষা ছিল, এই গ্রন্থ পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়। "শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের রচনা অতিশয় সরল, এমন কি বঙ্গীয় অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণীগণ ও সামান্য বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট নিম্নশ্রেণীর পুরুষগণ এই গ্রন্থ অনায়াসে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়। ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে যোল সতর অক্ষর বা বার তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনেক শব্দই তাৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ। সে সকল শব্দের অর্থ নিতান্ত রাঢ়ীয় লোক ব্যতীত বুঝিতে পারে না। ইহাতে যতই দোষ থাকুক, বিলাতী লোকেরা যেরূপ চসারকে মান্য করেন, আমরা কাব্য সম্বন্ধে ইহাকে তদ্রূপ মান্য করি।" (শ্রীকৃষ্ণবিজয়—উপক্রমণিকা) এই কাব্যের ভাষা কিরূপ প্রাঞ্জল ও তৎকালোচিত বিশুদ্ধ বাঙ্গলা তাহার নিদর্শনস্বরূপে নিয়ে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

"নানা বর্ণে সম্পূর্ণ সেই বৃন্দাবন।
গোপী লয়ে ক্রীড়া করিবারে হৈল মন॥
শারদ পূর্ণিমা শশী করিল উদয়ে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু মনোহর বহে॥
কোকিলের কলরব ভ্রমর ঝঙ্কার।
কুসুমিত দশদিক বসন্ত অবতার।
নবকিশলয় বৃক্ষ শোভে বৃন্দাবনে।
অধিক বাড়িল দিবি চন্দ্রের কিরণে॥
কাম অবতার করি বংশীতে নাদ দিল।
শুনিয়া গোকুল নারী মূর্চ্ছিত হইল॥
জানিল গোবিন্দবংশী রায় বৃন্দাবনে।
চলিল সকল নারী একচিত্ত মনে॥"

এক্ষণে অনেকে বঙ্গভাষায় আদিকাব্য-রচয়িতা এই অপরিচিত কবির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন। ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন, আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহাদের সমভিব্যাহারে পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দশরথ বসু নামক এক ব্যক্তি বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এই কাব্যপ্রণেতা মালাধর বসু উক্ত দশরথ বসুর অধস্তন ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে উৎপন্ন হন। ইনি রাঢ়ির কায়স্থকুলসম্ভূত ভগীরথ বসুর পুত্র, বৰ্দ্ধমান প্রদেশস্থ কুলীনগ্রাম ইহাঁর জন্মভূমি। কুলীনগ্রামে মালাধর বসুর বংশধরেরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন। গৌড়েশ্বর ইহাঁকে "গুণরাজখাঁন" উপাধি দিয়াছিলেন, এইজন্য "গুণরাজখাঁন" নামেই ইনি সাধারণতঃ পরিচিত হইয়া থাকেন।

যাত্রা-সমাপন।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।)

২৬ অক্টোবর। জাহাজের একটা দিন বর্ণনা করা যাক্।

সকালে ডেক্ ধুয়ে গেছে, এখনো ভিজে রয়েছে। দুইধারে ডেক্-চেয়ার বিশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের উপর রাশীকৃত। খালিপায়ে রাত-কাপড় পরা পুরুষগণ কেউবা বন্ধুসঙ্গে কেউবা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে' বেড়াচ্চে। ক্রমে যখন আটটা বাজ্‌ল এবং একটি আধটি করে' মেয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান।

স্নানের ঘরের সম্মুখে বিষম ভিড়। তিনটি মাত্র স্নানাগার

আমরা অনেকগুলি দ্বারস্থ। তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হাতে দ্বার-মোচনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দশ মিনিটের অধিক স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই।

স্নান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষের সমাগম হয়েচে। ঘন ঘন টুপি উদ্‌ঘাটন করে' মহিলাদের এবং শিরঃকম্পে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদন পূর্ব্বক শীত গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করা গেল।

নটার ঘণ্টা বাজ্‌ল। ব্রেক্‌ফাষ্ট প্রস্তুত। বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপানপথ দিয়ে নিম্নকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে। ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট রইল না। কেবল সারি-সারি শূন্যহৃদয় চৌকি ঊর্দ্ধমুখে প্রভুদের জন্যে অপেক্ষা করে' রইল।

ভোজনশালা প্রকাণ্ডঘর। মাঝে দুইসার লম্বা টেবিল, এবং তার দুইপার্শ্বে খণ্ড খণ্ড ছোট ছোট টেবিল। আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টেবিল অধিকার করে' সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুধা নিবৃত্তি করে' থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরায় এবং হাস্যকৌতুক গল্পগুজবে এই অনতিউচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়। ডেক্ ধোবার সময় কার চৌকি কোথায় ফেলেচে তার ঠিক নেই।

তারপর চৌকি খুঁজে নিয়ে আপনার জায়গাটুকু গুছিয়ে নেওয়া বিষম ব্যাপার। যেখানে একটু কোণ, যেখানে একটু

বাতাস, যেখানে একটু রৌদ্রের তেজ কম, যেখানে যার অভ্যাস সেইখানে ঠেলেঠুলে টেনেটুনে পাশ কাটিয়ে পথ করে' আপনার চৌকিটি রাখতে পারলে সমস্ত দিনের মত নিশ্চিন্ত।

তারপরে দেখা যায় কোন চৌকিহারা ম্লানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করচে, কিম্বা কোন বিপদ্‌গ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে নিজেরটি বিশ্লিষ্ট করে' নিয়ে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারচে না—তখন আমরা পুরুষগণ নারীসহায়ব্রতে চৌকিউদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে সুশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জ্জন করে' থাকি।

তার পরে যে যার চৌকি অধিকার করে' বসে' থাওয়া যায়। ধূম্রসেবীগণ, হয় ধূম্রকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্ত মনে ধূমপান করচে। মেয়েরা অর্দ্ধনিলীন অবস্থায় কেউবা নবেল পড়চে, কেউবা শেলাই করচে; মাঝে মাঝে দুই একজন যুবক ক্ষণেকের জন্যে পাশে বসে' মধুকরের মত কানের কাছে গুন্ গুন্ করে' আবার চলে যাচ্চে।

আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্র এক দলের মধ্যে কয়ট্‌স্ খেলা আরম্ভ হল। দুই বাল্‌তি পরস্পর হতে হাত দশেক দূরে স্থাপিত হল। দুই যুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে' পালাক্রমে স্বস্ব স্থান থেকে কল্‌সীর বিড়ের মত কতকগুলি রজ্জুচক্র বিপরীত বাল্‌তির মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। যে পক্ষ সর্ব্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত। মেয়ে খেলোয়াড়েরা কথনো জয়োচ্ছ্বাসে কথনো নৈরাশ্যে উর্দ্ধকণ্ঠে চীৎকার করে' উঠ্‌চেন। কেউবা দাঁড়িয়ে দেখ্‌চে, কেউবা গণনা করচে, কেউবা খেলায় যোগ দিচ্চে, কেউবা আপন আপন পড়ায় কিম্বা গল্পে নিবিষ্ট হয়ে আছে।

একটার সময় আবার ঘণ্টা। আবার আহার। আহারান্তে উপরে ফিরে এসে দুইস্তর খাদ্যের ভারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত, আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্চে। কেদারায় হেলান্ দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ নীলনয়নে নিদ্রাবেশ হয়ে আস্‌চে। কেবল দুই একজন দাবা, ব্যাক্‌গ্যামন্‌ কিম্বা ড্রাফ্‌ট্‌ খেল্‌চে, এবং দুই একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিনই কয়ট্‌স্‌ খেলায় নিযুক্ত। কোন রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখ্‌চে, এবং কোন শিল্পকুশলা কৌতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহযাত্রীর ছবি আঁক্‌তে চেষ্টা করচে।

ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল। তখন তাপক্লিষ্ট ক্লান্তকায়গণ নীচে নেমে গিয়ে রুটিমাখনমিষ্টান্ন সহযোগে চা-রস পান করে' শরীরের জড়তা পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্ব্বার যুগল মূর্ত্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং মৃদুমন্দ হাস্যালাপ আরম্ভ হল। কেবল দু'চার জন পাঠিকা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারচে না,—দিবাবসানের ম্লান ক্ষীণালোকে একাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করচে।

দক্ষিণে জলন্ত কনকাকাশ এবং অগ্নিবর্ণ জলরাশির মধ্যে সূর্য্য অস্ত গেল এবং বামে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্ব হতেই চন্দ্রোদয় হয়েচে। জাহাজ থেকে পূর্ব্বদিগন্ত পর্য্যন্ত বরাবর জ্যোৎস্না-রেখা ঝিক্ ঝিক্ করচে। পূর্ণিমার সন্ধ্যা নীল সমুদ্রের উপর আপনার শুভ্র অঙ্গুলি স্থাপন করে' আমাদের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত পূর্ব্ব ভারতবর্ষের পথ নির্দ্দেশ করে' দিচ্চে।

জাহাজের ডেকের উপরে এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে' উঠ্‌ল। ছটার সময় ডিনারের প্রথম ঘণ্টা বাজ্‌ল। বেশ পরিবর্ত্তন উপলক্ষে সকলে স্বস্ব কক্ষে প্রবেশ করলে। আধঘণ্টা পরে দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজ্‌ল। ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল। সারিসারি নরনারী বসে' গেছে। কারো বা কালো কাপড়, কারো রঙীন কাপড়, কারো বা শুভ্রবক্ষ অর্দ্ধ-অনাবৃত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুৎ-আলোক জ্বল্‌চে। গুন্‌গুন্ আলাপের সঙ্গে কাঁটাচামচের টুং টাং ঠুং ঠুং শব্দ উঠ্‌চে, এবং বিচিত্র খাদ্যের পর্য্যায় পরিচারকদের হাতে হাতে নিঃশব্দ স্রোতের মত যাতায়াত করচে।

আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল বায়ু সেবন। কোথাও বা যুবকযুবতী অন্ধকার কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গিয়ে গুন্‌গুন্ করচে, কোথাওবা দু'জনে জাহাজের বারান্দা ধরে' ঝুঁকে পড়ে' রহস্যালাপে নিমগ্ন, কোন কোন যুড়ি গল্প করতে করতে ডেকের আলোক ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দ্রুতপদে একবার দেখা দিচ্চে একবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে, কোথাওবা একধারে পাঁচসাত জন স্ত্রীপুরুষ এবং জাহাজের কর্ম্মচারী জটলা করে' উচ্চহাস্যে প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বসিত করে' তুল্‌চে। অলস পুরুষরা কেউবা বসে' কেউবা দাঁড়িয়ে কেউবা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় চুরট খাচ্চে, কেউবা স্মোকিং সেলুনে কেউবা নীচে খাবার ঘরে হুইস্কি-সোডা পাশে রেখে চার জনে দল বেঁধে বাজি রেখে তাস খেলচে। ওদিকে সঙ্গীতশালায় সঙ্গীতপ্রিয় দু'চার জনের সমাবেশ হয়ে গান বাজনা এবং মাঝে মাঝে করতালি শোনা যাচ্চে।

ক্রমে সাড়ে দশটা বাজে,—মেয়েরা নেবে যায়,—ডেকের

উপরে আলো হঠাৎ নিবে যায়,—ডেক্ নিঃশব্দ নির্জ্জন অন্ধকার হয়ে আসে, এবং চারিদিকে নিশীথের নিস্তব্ধতা, চন্দ্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের অশ্রান্ত কলধ্বনি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

২৭ অক্টোবর। লোহিত সমুদ্রের গরম ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌চে। ডেকের উপর মেয়েরা সমস্ত দিন তৃষাতুরা হরিণীর মত ক্লিষ্ট কাতর হয়ে রয়েচে। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে পাখা নাড়চে, স্মেলিং সল্ট্ শুঁক্‌চে, এবং সকরুণ যুবকেরা যখন পাশে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করচে তখন নিমীলিতপ্রায় নেত্রপল্লব ঈষৎ উন্মীলন করে' ম্লানহাস্যে কেবল গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা আপন সুকুমার দেহলতার একান্ত অবসন্নতা ইঙ্গিতে জানাচ্চে। যতই পরিপূর্ণ করে' টিফিন্ এবং লেবুর সরবৎ খাচ্চে, ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়চে, নেত্র নিদ্রানত ও সর্ব্বশরীর শিথিল হয়ে আস্‌চে।

২৮ অক্টোবর। আজ এডেনে পৌঁছন গেল।

২৯ অক্টোবর। আমাদের জাহাজে একটি পার্সী সহযাত্রী আছে। তার ছুঁচোলো ছাঁটা দাড়ি এবং বড় বড় চোখ সর্ব্বপ্রথমেই চোখে পড়ে। অল্প বয়স। নয় মাস য়ুরোপে বেড়িয়ে বিলিতী পোষাক এবং চালচলন ধরেচে। বলে, ইণ্ডিয়া লাইক্ করে না। বলে, তার য়ুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশই স্ত্রীবন্ধু) কাছ থেকে তিনশো চিঠি এসে তার কাছে জমেছে, তাই নিয়ে বেচারা মহামুস্কিলে পড়েচে, কখনই বা পড়বে কখনই বা জবাব দেবে! লোকটা আবার নিজে বন্ধুত্ব করতে বড়ই নারাজ, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় বন্ধুত্ব তার মাথার উপরে অনাহূত অযাচিত বর্ষিত হতে থাকে। সে বলে বন্ধুত্ব করে' কোন "ফন্" নেই! উপরন্তু কেবল ল্যাঠা! এমন কি শত শত জর্ম্মান ফরাসী ইটালিয়ান এবং ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে সে "ফ্লার্ট্" করে' এসেচে

কিন্তু তাতে কোন মজা পায়নি! একটা মেয়েকে কতকগুলো মিথ্যে কথা বলা যায়, সে আদর করে' পাথার বাড়ি মারে এই ত ফ্লার্টেশন, এতে "ফন্" নেই! লোকটা পৃথিবীতে কিছুতেই যথেষ্ট মজা পাচ্চে না; কিন্তু তার কাছ থেকে অন্য লোকে যে মজা উপভোগ করচে তা বোধ হয় সে স্বপ্নেও জানে না।

২ নবেম্বর। ভারতবর্ষের কাছাকাছি আসা গেছে। কাল বোম্বাই পৌঁছবার কথা।

আজ সুন্দর সকালবেলা। ঠাণ্ডা বাতাস বচ্চে—সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করচে, উজ্জ্বল রৌদ্র উঠেচে; কেউ কয়ট্স্ খেল্‌চে, কেউ নবেল পড়চে, কেউ গল্প করচে; ম্যুজিক সেলূনে গান চল্‌চে, স্মোকিং সেলূনে তাস্ চল্‌চে, ডাইনিং সেলূনে খানার আয়োজন হচ্চে, এবং একটি সঙ্কীর্ণ ক্যাবিনের মধ্যে আমাদের একটি বৃদ্ধ সহযাত্রী মরচে।

সন্ধ্যা আটটার সময় ডিলন্ সাহেবের মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যার সময় একটি নাটক অভিনয় হবার কথা ছিল।

৩ নবেম্বর। সকালে অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের পর ডিলনের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল। আজ আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন।

অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাইবন্দরে পৌঁছল।

৪ নবেম্বর। জাহাজ ত্যাগ করে' ভারতবর্ষে নেমে এখন আমার অদৃষ্টের সঙ্গে আর কোন মনান্তর নেই। সংসারটা মোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্চে। কেবল একটা গোল বেধেছিল—টাকাকড়িসমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে এসেছিলুম, তাতে করে' সংসারের আকৃতির হঠাৎ অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে

অবিলম্বে জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে' এনেছি। এই ব্যাগ্ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মত একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনি সাবধান করে' দিলুম ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বল্‌লে, ক্ষেপেছ! আমাকে তেমনি লোক পেয়েছ!—আজ সকালে তাকে বিলক্ষণ এক চোট ভৎর্সনা করেচি—সে নতমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল। তার পর যখন ব্যাগ ফিরে পাওয়া গেল তখন আবার তার পিঠে হাত বুলতে বুলতে হোটেলে ফিরে এসে স্নান করে' বড় আরাম বোধ হচ্চে! এই ঘটনা নিয়ে আমার স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষপাত করে' পরিহাস করবেন সৌভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই। সুতরাং রাত্রে যখন কলিকাতামুখী গাড়িতে চড়ে' বসা গেল, তখন যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম তবু আমার সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি।

স্বরবর্ণ 'এ'।

বাঙ্গলায় 'এ' স্বরবর্ণ আদ্যক্ষরস্বরূপে ব্যবহার হইলে তাহার দুইপ্রকার উচ্চারণ দেখা যায়। একটি বিশুদ্ধ এ, আর একটি অ্যা। 'এক' এবং 'একুশ' শব্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একারের বিকৃত উচ্চারণ বাঙ্গলায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, কেবল এসম্বন্ধে একটি পাকা নিয়ম খুব দৃঢ় করিয়া বলা যায়।—পরে ইকার অথবা উকার থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একারের কখনই বিকৃতি হয় না। 'জ্যেঠা' এবং 'জ্যেঠী' 'বেটা' এবং 'বেটী' 'একা' এবং 'একটু' তুলনা করিয়া দেখিলে ইহার প্রমাণ

হইবে। এ নিয়মের একটিও ব্যতিক্রম আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

কিন্তু একারের বিকার কোথায় হইবে তাহার একটা নিশ্চিত নিয়ম বাহির করা এমন সহজ নহে—অনেকস্থলে দেখা যায় অবিকল একইরূপ প্রয়োগে 'এ' কোথাও বা বিকৃত কোথাও বা অবিকৃত ভাবে আছে। যথা 'তেলা' (তৈলাক্ত) এবং 'বেলা' (সময়)।

প্রথমে দেখা যাক্, পরে অকারান্ত অথবা বিসর্গ শব্দ থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী একারের কিরূপ অবস্থা হয়।

অধিকাংশ স্থলেই কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা কেশ বেশ পেট হেঁট বেল তেল তেজ শেজ খেদ বেদ প্রেম হেম ইত্যাদি।

কিন্তু দন্ত্য 'ন'য়ের পূর্ব্বে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা ফেন (ভাতের), সেন (পদবী), কেন, যেন, হেন। মূর্দ্ধণ্য 'ণ'য়ের পূর্ব্বেও সম্ভবতঃ এই নিয়ম খাটে কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গলায় তাহার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। একটা কেবল উল্লেখ করি, কেহ কেহ "দিন-ক্ষণ'কে 'দিন-ক্ষ্যাণ' বলিয়া থাকেন। এইখানে পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি 'ন' অক্ষর যে কেবল একারকে আক্রমণ করে তাহা নহে অকারের প্রতিও তাহার বক্রদৃষ্টি আছে—বন, মন, ধন, জন প্রভৃতি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে উক্ত শব্দগুলিতে আদ্যাক্ষরযুক্ত অকারের বিকৃতি ঘটিয়াছে। বট, মঠ, জল প্রভৃতি শব্দের প্রথমাক্ষরের সহিত তুলনা করিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

আমার বিশ্বাস, পরবর্ত্তী 'চ' অক্ষরও এইরূপ বিকারজনক। কিন্তু কথা বড় বেশি পাওয়া যায় না। একটা কথা আছে—

প্যাচ্। কিন্তু সেটা যে ‘পেঁচ’ শব্দ হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে এমন অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। আর একটা বলা যায়, ট্যাচ্। ‘ট্যাচ্’ করিয়া দেওয়া। এ শব্দ সম্বন্ধেও পূর্ব্বকথা খাটে। অতএব এটাকে নিয়ম বলিয়া মানিতে পারি না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী পাঠকেরা কাল্পনিক শব্দবিন্যাস দ্বারা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন চয়ের পূর্ব্বে বিশুদ্ধ একার উচ্চারণ জিহ্বার পক্ষে কেমন সহজ বোধ হয় না। এইখানে বলা আবশ্যক আমি দুই অক্ষরের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি।

পূর্ব্বনিয়মের দুটো একটা ব্যতিক্রম আছে। কোন পাঠক যদি তাহার কারণ বাহির করিতে পারেন ত বাধিত হইব। এদিকে ‘ভেক’ উচ্চারণে কোন গোলযোগ নাই, অথচ ‘এক’ শব্দ উচ্চারণে ‘এ’ স্বর বিকৃত হইয়াছে। আর একটা ব্যতিক্রম ‘লেজ’ (লাঙ্গুল)। ‘তেজ’ শব্দের একার বিশুদ্ধ, ‘লেজ’ শব্দের একার বিকৃত।

বাঙ্গলায় দুই শ্রেণীর শব্দ-দ্বিগুণীকরণ প্রথা প্রচলিত আছে।

১। বিশেষণ ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। যথা, বড়-বড়, ছোট-ছোট, বাঁকাবাঁকা, নেচে-নেচে, গেয়ে-গেয়ে, হেসে-হেসে ইত্যাদি।

২। শব্দানুকরণমূলক বর্ণনাসূচক ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা প্যাঁট্প্যাট, টাঁটাঁ, খিট্খিট্ ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণীকরণের স্থলে পাঠক কুত্রাপিও আদ্যক্ষরে একার সংযোগ দেখিতে পাইবেন না। গাঁগাঁ, গোঁ-গোঁ, চাঁচাঁ, চ্যাচ্যাঁ, টুক্টুক্ পাইবেন, কিন্তু গেঁগেঁ চেঁচেঁ কোথাও নাই। কেবল নিতান্ত যেখানে শব্দের অবিকল অনুকরণ সেইখানেই দৈবাৎ একারের সংশ্রব পাওয়া যায়, যথা

ঘেউঘেউ। এরূপ স্থলে অ্যাকারের প্রাদুর্ভাবটাই কিছু বেশি—যথা, ফ্যাস্‌ফ্যাস্‌, গ্যাকর্থ্যাক্‌, স্যাৎস্যাৎ, ম্যাড়ম্যাড়।

এই শব্দগুলিকে বিশেষণে পরিণত করিলে দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমে অ্যাকারের পরিবর্ত্তে একার সংযুক্ত হয়; যথা, স্যাৎসেঁতে, ম্যাড়্‌মেড়ে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। স্যাৎ-সেঁতিয়া হইতে স্যাৎসেঁতে হইয়াছে। বলা হইয়াছে ইকারের পূর্ব্বে এ উচ্চারণ বলবান থাকে।

ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্য শব্দের একারের উচ্চারণসম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম সন্ধান করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখ 'খেলা' এবং 'গেলা' (গলাধঃকরণ) ইহাদের প্রথমাক্ষরবর্ত্তী একারের উচ্চারণভেদ দেখা যায়। প্রথমটি খ্যালা, দ্বিতীয়টি গেলা।

আমি স্থির করিলাম—সংস্কৃত মূল শব্দের ইকারের অপভ্রংশে বাঙ্গালায় যেখানে 'এ' হয় সেখানে বিশুদ্ধ 'এ' উচ্চারণ থাকে। খেলন হইতে খেলা, কিন্তু গিলন হইতে গেলা—এই জন্য শেষোক্ত এ অবিকৃত আছে। ইহার পোষক আরো অনেক-গুলি প্রমাণ পাওয়া গেল। যেমন মিলন হইতে মেলা (মিলিত হওয়া), মিশ্রণ হইতে মেশা, চিহ্ন হইতে চেনা, ইত্যাদি।

ইহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখিলাম, বিক্রয় হইতে বেচা (ব্যাচ্যা), সিঞ্চন হইতে সেঁচা (স্যাঁচা), চীৎকার হইতে চেঁচানো (চ্যাঁচানো)।

তখন আমার পূর্ব্বসন্দেহ দৃঢ় হইল যে, 'চ' অক্ষরের পূর্ব্বে একার উচ্চারণের বিকার ঘটে। এই জন্যই চয়ের পূর্ব্বে আমার এই শেষ নিয়মটি খাটিল না।

যাহা হউক্‌, যদি এই শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে একটা সর্ব্বব্যাপী নিয়ম করিতে হয় তবে এরূপ বলা যাইতে পারে—যে সকল

অসমাপিকা ক্রিয়ার আদ্যাক্ষরে ই সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্য রূপ ধারণকালে তাহাদের সেই ইকার একারে বিকৃত হইবে, এবং অসমাপিকরূপে যে সকল ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে এ সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপে তাহাদের সেই একার অ্যাকারে পরিণত হইবে।

যথা—

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে—	বিশেষ্য রূপে।
কিনিয়া।	কেনা।
বেচিয়া।	ব্যাচা।
মিলিয়া।	মেলা।
ঠেলিয়া।	ঠ্যালা।
লিখিয়া।	লেখা।
দেখিয়া।	দ্যাখা।
হেলিয়া।	হ্যালা।
গিলিয়া।	গেলা।

এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম পাওয়া যাইবে না।

মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, এ হইতে একেবারে আ উচ্চারণে যাওয়া রসনার পক্ষে কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য, আ হইতে এ উচ্চারণে গড়াইয়া পড়া সহজ। এই জন্য আমাদের অঞ্চলে আকারের পূর্ব্ববর্ত্তী একার প্রায়ই "অ্যা" নামক সন্ধিস্বরকে আপন আসন ছাড়িয়া দিয়া রসনার শ্রমলাঘব করে।

এই উচ্চারণের নিয়ম সম্বন্ধে পাঠকদিগের যদি কোন বক্তব্য থাকে লিখিয়া পাঠাইলে সুখী হইব।

তুমি।

সংসার তোমায় দিল অন্তিম বিদায়
তবু তুমি ঘুরে মর সংসার মায়ায়!
এত প্রেম, এত স্নেহ, প্রিয়জন-গেহ
নারিলে ভুলিতে; তাই ছাড়ি তব দেহ
আসিয়াছ জীবনের পরপার হ'তে।
ভালবাসো যারে, তার নয়নের পরে
স্বপ্নসম ঘিরে থাক, না দাও ধরিতে।
পরশের তরে যবে চিত্ত কেঁদে মরে
চোখে বহে নীর, প্রাণ চাহেগো মরিতে,
শূন্য হ'তে শুনি তব আশ্বাস-বচন।
তাই এ হৃদয়ে সদা আশা জেগে রয়
তোমায় আমায় পুন হইবে মিলন;
যে প্রেমে চঞ্চল তুমি করিলে হৃদয়
সেই প্রেমে আরবার হব নিমগন।

———

বোম্বাই সমাজসংস্কার।

ভাই—

সেদিন এখানকার ইউনিয়ন্ ক্লবের অধিবেশনে আমাদের সবজজ চিন্তামণ নারায়ণ ভট বিবাহসংস্করণ বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। পুণায় পার্টি লইয়া কতক-দিন হইতে সংবাদপত্রে যে ভয়ানক তুফান বহিতেছে তাহা দেখিয়া এ দেশীয় সমাজসংস্কারকদের উপর আমার এমন অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে যে, তাহাদের বক্তৃতা শুনিলে গায়ে জর আসে, তথাপি নিমন্ত্রণের উপরোধ আর কৌতূহলও ছিল ভটজী কি বলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহার সারাংশ এই:—সমাজসংস্কার সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আমা-দের মতের মিল থাকিলেও কাজের বেলায় অগ্রসর হইতে সাহস করি না। এরূপ ধর্ম্মভীরুতা নিন্দনীয়। এই সকল ভীরুদিগকে যদি উভয় কূল রক্ষা করিয়া চলিবার কোন সদুপায় দেখাইয়া দেওয়া যায় তাহাতেও লাভ আছে। তিনি বিবাহ সম্বন্ধীয় তিনটী বিষয়ের অবতারণা করিলেন।

বাল্যবিবাহ।

বিবাহে ব্যয়বাহুল্য।

এক বর্ণের ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ।

আমাদের মধ্যে বিবাহে অনেকে বিস্তর ব্যয় করিয়া পরিশেষে সন্তাপ কিনিয়া লন—এই প্রথা অতীব অনিষ্টকর। সকল কার্য্যেই আপনার আয় বুঝিয়া ব্যয় করা কর্ত্তব্য। যে জাতিতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক তাহাদের মধ্যে বরপক্ষীয়েরা অনেক হাঁকিয়া বসেন, কন্যাকর্ত্তাদের দায়ে পড়িয়া পণ অঙ্গীকার করিতে

হয়। তা ছাড়াও অনেক গরীব লোক ধার কর্জ্জ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। ইহার প্রতিবিধান সহজসাধ্য। গুজরাত রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে এই অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা দেখা যায়, এদেশেও ইহার সূত্রপাত করা উচিত।

এক জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধেও বিশেষ কোন বাধা হইতে পারে না। যাহাদের মধ্যে পরস্পর পান-ভোজনের নিয়ম আছে তাহাদের বিবাহে আদান প্রদান চলিবে না কেন? আমাদের দেশের হাওয়ার গুণে জাতিগত পার্থক্য আসিয়া পড়ে; যাহাতে জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক দেশহিতৈষী জনের লক্ষ্য যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন। রাজনৈতিক উন্নতির জন্য আমরা আবদার করিতে ছাড়ি না, কিন্তু সামাজিক ঐক্যবন্ধন সে উন্নতির প্রথম সোপান। যে সকল কারণে জাতিতে জাতিতে বর্ণে বর্ণে পার্থক্য উৎপাদন করিতেছে তাহা সাধ্যমত পরিহার কর, আপনা হইতেই জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত হইবে। এক জাতির ভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহের বাধা কি তাহার কোন সমীচীন কারণ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। গুজরাতে নাগর ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যায় যাহারা সহরে বাস করে তাহারা পল্লীগ্রামস্থ নাগরদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া কন্যা দিতে নারাজ। আমাদের মধ্যে যেমন রাঢ়ী বারেন্দ্রের মধ্যে বিবাহ নিষেধ, এদেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কতকটা সেইরূপ দেখা যায়। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের তিনশ্রেণী—দেশস্থ, কোকনস্থ, কহ্রাড়। তাহারা মূলে একজাতি কিন্তু বাসস্থানের পার্থক্যবশতঃ তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহসম্বন্ধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে পরস্পর পানভোজন চলে কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধ নাই। এই পার্থক্য দূর হইয়া যাহাতে ঐক্যবন্ধন হয়

তাহার উপায় সহজসাধ্য, কারণ ইহার মূলে কোন শাস্ত্রীয় বিধান নাই—দেশাচারের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। এইরূপ শুনা যায় যে, প্রথম বাজীরাও এই তিন শ্রেণীর ঐক্যসাধন মানসে প্রত্যেক শ্রেণী হইতে এক একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আমরা এখন কেন এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করি?

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন। শিক্ষিত নব্য দলের মধ্যে অধিকাংশ লোকে এই প্রথার দোষ স্বীকার করেন। বালক বালিকার যে শিক্ষার বয়স সে বয়সে তাহার স্কন্ধে বিবাহভার চাপাইয়া দিলে শিক্ষার ব্যাঘাত হয় ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। মাতা অল্পবয়সে প্রসূতি হইলে সন্তান দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয় ইহাই বা কে না স্বীকার করিবে? তবে পিতামাতা কেন তাঁহাদের সন্তানের অকালে বিবাহ দিতে এত ব্যস্ত! পিতামাতার কর্ত্তব্য সন্তানদের যথোচিত শিক্ষা দান করিয়া তাহাদিগকে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত করা, বিবাহের ঘটকালী করা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। বিবাহ স্ত্রীপুরুষের নিজস্ব সামগ্রী। তুমি বলিবে হিন্দু সমাজের যেরূপ গঠন্ তাহাতে স্ত্রীপুরুষের কোর্টসিপের সুবিধা নাই—বাপমায়ের ঘটকালী ব্যতীত চলে না, কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলিতে পার না যে, বিবাহকালে আসল পাত্র পাত্রীর নিজস্ব মতামতের কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের অপ্রাপ্ত বয়সে যখন তাহারা বিবাহের অর্থই বুঝিতে পারে না—নিজের মতামত ব্যক্ত করিতে পারে না—তখন তাহাদের স্কন্ধে এমন গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া যাহা তাহাদিগকে আজীবন বহন করিতে হইবে—কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইবার পন্থা নাই—পিতা মাতার কি অন্যায়! বাল্যবিবাহ হইতে হিন্দুসমাজে যে সকল মহা অনিষ্ট উদ্ভূত হইতেছে তাহা কাহারো

চখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক নাই। অনেকেই বাল্য-বিবাহের দোষ স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলায় তাঁহারা বড় এগোতে চান না। ভটজী ইহার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন বাগ্দান হইয়া থাকু, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেওয়া যাইবে। তাহাতে হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ হয় না। তিনি নিজের পরিবারে তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার বারো বৎসরের কন্যার একটী আঠার বৎসরের বালকের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। বালকটী নাগপুর কালেজে অধ্যয়ন করিতেছে, কন্যা পুণা স্ত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাহাদের মধ্যে এক্ষণে কেবল বাক্-নিশ্চয় হইয়াছে, কতক বৎসর পরে বিবাহ হইবে। এখন বিবাহ দিলে কন্যাটির লেখাপড়া বন্ধ হয়—তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার আবশ্যক হয়—উল্লিখিত উপায়ে দু' দিক বজায় রহিল। কিন্তু এ উপায় কতদূর ফলোপধায়ী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বাক্-নিশ্চয় কতদূর বন্ধনকারী? মনে কর বিবাহের আগে ভাবী বরের মৃত্যু হইল, তাহার ফল কি হইবে? মেয়ে বিধবা গণ্য হইবে অথবা পুনর্ব্বিবাহে তাহার অধিকার থাকিবে! বিবাহ না করিয়াই বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করা সামান্য কষ্টকর নহে। আমার মতে এরূপ অর্দ্ধ পদক্ষেপের কোন ফল নাই—একেবারে লম্ফ প্রদান করিয়া বেড়া ডিঙ্গান' আবশ্যক। কিন্তু একটী বিষম বাধা আছে—সে বাধা মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহই বল আর কোন সামাজিক কুপ্রথাই বল—তাহা নিবারণের প্রধান উপায় হচ্চে স্ত্রীশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কর, অল্পে অল্পে সকল প্রকার সামাজিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে সন্দেহ নাই। অন্যান্য উপায় একদেশব্যাপী ও নিষ্ফল।

এদেশে স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সাধন বঙ্গদেশ অপেক্ষা সহজসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার এক কারণ এদেশে অবরোধপ্রথা নাই। এখানে আমাদের দেশের মত অবগুণ্ঠনও নাই—অন্তঃপুরও নাই। ইহা হইতেই বোধ হয় অবরোধপ্রথা আসল হিন্দু প্রথা নয়—যে সকল দেশ বহুদিন মুসলমানদিগের অধীনে ছিল সেই সকল দেশে এই কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সে যাহা হউক অবরোধপ্রথা নাই বলিয়া এদেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা বঙ্গনারীদের অপেক্ষা যে অধিক উন্নত তা ত বোধ হয় না। যদিও অন্তঃপুরবাসের কড়াকড় নিয়ম নাই তথাপি ভদ্র মেয়েরা সেই পিঞ্জরের পাখী—জনসমাজে স্ত্রীপুরুষের মেলা-মেশা ঠিক ত এখানে দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? আমি যতদূর দেখিতেছি এখানে পরদা ভাঙ্গা কিছুই দুষ্কর নহে—কেবল একজন পথপ্রদর্শক আবশ্যক। বোম্বাই পুণা প্রভৃতি বড় বড় সহরে স্ত্রীস্বাধীনতা অনেক প্রসারিত দেখা যায়। এ দেশীয় রাজাদের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। গোণ্ডলের রাজা, বরদার গাইকওয়াড় সস্ত্রীক ইউরোপে গিয়া ইহার পথ অনেকটা মুক্ত করিয়াছেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কি ছিল আর এখনই বা কি? এ বিষয়ে কত পরিবর্ত্তন! আমরা নিজ নিজ পরিবারমধ্যেই কত পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছি—রাজা রাণীও এই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন—ক্রমে সেই দুয়া সুয়া রাণীর জেনানাবদ্ধ পরিবারের মধ্যেও আলোক বাতাস প্রবেশ করিতেছে। যাঁহারা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিলাপ করেন তাঁহারা জানেন না স্ত্রীলোকের বিনয় লজ্জা স্বাভাবিক ভূষণ, অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন নাই—ধর্ম্মরক্ষার জন্য অন্তঃপুর-জেলখানার আবশ্যক নাই—মুক্ত সংসারই স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্মক্ষেত্র—

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

এখনো কি আমাদের দেশে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে! সেদিন একটা কাগজে দেখিতেছিলাম সেই পুরাতন রোগের অদ্যাপি অনেক অবশিষ্ট আছে। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবদ্দশায় বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় এক তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সঙ্গে তাঁহার কৌলীন্য প্রথা লইয়া তর্কবিতর্ক হয়। সভার মতে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহের সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। তাহার প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন হুগলী জিলায় ন্যূনাধিক ১০০ পল্লী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ১৩৩ জন লোকের প্রত্যেকের পাঁচ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পত্নী। তিনি নাম ধাম সমেত এই বিবাহের এক তালিকা প্রস্তুত করেন তাহা হইতে দেখা যায় একজনের ৮০ জন ভার্য্যা—একজনের ৭২—তৃতীয়ের ৬২, চতুর্থের ৫৬, পঞ্চমের ৫৫, ষষ্ঠের ৪৪। তিন জনের প্রত্যেকের ৫০ স্ত্রী—তিন জনের ৪০—সাত জনের ২১ হইতে ২৮—ছয় জনের ২০—তের জনের ১৬—চৌদ্দ জনের ১০—ষোল জনের ১৬—একুশ জনের ৫। যাহাদের বিবাহ পাঁচের কম তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে তাহা নির্দ্দেশ করিতে গেলে সমুদায় পুঁথি ভরিয়া যায়। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার এক ক্ষুদ্র প্রান্তের এই অবস্থা। এইক্ষণে কিরূপ? সঞ্জীবনীসম্পাদক গত বর্ষে এই বিষয়ে এক তালিকা প্রকাশ করেন। তিনি ৩২৮ গ্রাম পরিদর্শন করেন ও গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে যাঁহারা বিবাহ করিয়াছেন—যাহাদের ৫ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স তাঁহাদের জীবনী অনুসন্ধান করিয়া দেখেন। প্রায় ৫৮৪টী ব্রাহ্মণ-বিবাহ তাঁহার সমালোচনার

বিষয়। ফলে এই দাঁড়ায়, ৩৩৯ জনের দুই স্ত্রী আর ২৪৫ জনের দুয়ের অধিক স্ত্রী। এই ২৪৫ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে ৩৯ এর ৩ স্ত্রী—৩১এর ৪, ৮ জনের ৫, ৯ জনের ৬, ৫ জনের ৭, ৫ জনের ৮, ১০ ১২, ১৩ করিয়া দুই দুই জনের বিবাহ। ৩ জনের ১৪, এক জনের ৩২। একজন ১২ বৎসরের বালকের দুই স্ত্রী। একজন ৩৭ বর্ষীয় যুবকের ৩৫ পত্নী বর্ত্তমান। কি ভয়ানক! বিদ্যাসাগর মহাশয় যে তালিকা প্রস্তুত করেন তাহাতে যে সকল বিবাহের উল্লেখ আছে তাহার পরে ইহার অধিকাংশ বিবাহ সঙ্ঘটিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে বঙ্গদেশে বহুবিবাহ প্রথা বিলক্ষণ সতেজ। যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা কেবল কতকগুলি গ্রামের মধ্যে বদ্ধ, সমুদায় বঙ্গভূমির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই অনিষ্টময় প্রথা কতদূর ব্যাপী তাহা সহজে অনুধাবন করা যাইতে পারে। যাঁহারা হিন্দুসমাজে গার্হস্থ্যাশ্রম পরিশোধিত দেখিতে চান তাঁহারা এই কুপ্রথা উন্মূলনে কায়মনে যত্নবান্ হউন।

লোক-চেনা।

শিরোলক্ষণ।

দৈহিক প্রকৃতির লক্ষণ দেখিয়া কি রূপে লোক চিনিতে হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা গিয়াছে। এক্ষণে, মস্তকের গঠন দেখিয়া কিরূপে চরিত্র নির্ণয় করিতে হয় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। আমাদের মনোবৃত্তি কতগুলি, তাহাদের কি

কি কার্য্য, মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশে তাহাদের স্থান, ইত্যাদি তথ্যগুলি প্রথমতঃ মোটামুটি জানা আবশ্যক।

মনোবৃত্তির দুই প্রকাণ্ড বিভাগ—জ্ঞান ও ভাব। তন্মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির স্থান হচ্চে কপাল—মস্তকের বাকি অংশ যাহা কেশে আবৃত তৎসমস্তই ভাবের স্থান। ভাব দুই ভাগে বিভক্ত;—নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি। মস্তকের নিম্নপার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্থান। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আধিক্য হইলে কানের উপরে ও পশ্চাতে মাথার গঠন চওড়া ও ভর্‌পুর দেখায়। যাহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্ষীণতর তাহাদের ঐ অংশ অর্থাৎ মাথার দুই পার্শ্ব পাত্‌লা ও সংকীর্ণ। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত;—গার্হস্থ্যপ্রবৃত্তি ও স্বার্থপ্রবৃত্তি। গার্হস্থ্যপ্রবৃত্তি চারিটি;—স্ত্রৈপুরুষিক আসক্তি, বাৎসল্য, সখ্য, ও বাস্তনিষ্ঠা অর্থাৎ নিজ বাসস্থানের উপর মায়া। গার্হস্থ্যপ্রবৃত্তির আধিক্য হইলে মাথার পিছন দিক্‌টা লম্বাটে ও ভর্‌পুর দেখায়। এবং উহার লাঘব হইলে ঐ অংশ চ্যাপ্‌টা ও বসা দেখায়। স্বার্থ-প্রবৃত্তি এই-গুলি যথা,—(১) প্রতিবিধিৎসা অর্থাৎ বাধা অতিক্রমের ইচ্ছা—যুঝাযুঝি করিবার ইচ্ছা—সাহস; (২) জিঘাংসা অর্থাৎ ধ্বংশ করিবার—হানি করিবার ইচ্ছা—ক্রোধ; (৩) বুভুক্ষা অর্থাৎ আহারের ইচ্ছা; (৪) অর্জ্জন-স্পৃহা; (৫) জুগোপিষা অর্থাৎ মনের ভাব গোপন করিবার ইচ্ছা। মস্তকের পার্শ্বদেশে ও কানের চতুষ্পার্শ্বে এই সকল প্রবৃত্তির স্থান। উহাদের আধিক্য হইলে মাথার ঐ অংশ স্থূল ও বর্ত্তুলাকার দেখায়—কিন্তু উহাদের স্বল্পতা হইলে ঐ অংশ চ্যাপ্‌টা ও সংকীর্ণ দেখায়। উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি তিনভাগে বিভক্ত। যথা;—(১) উচ্চতর স্বার্থভাব (২) ধর্ম্মভাব ও (৩) বুদ্ধি-মিশ্র ভাব। উচ্চতর স্বার্থভাব এই গুলি যথা;—সাব-

ধানতা, লোকাদরপ্রিয়তা, আত্ম-সম্ভ্রম ও দৃঢ়তা—মাথার তেলোর শেষাংশ ও সেই শেষাংশের পার্শ্বদেশ এই সকল ভাবের স্থান। মাথার তেলোর বাকি অংশ ধর্ম্মভাবের স্থান। ধর্ম্ম-ভাব এইগুলি যথা;—সত্যনিষ্ঠা, আশা, বিশ্বাস, ভক্তি ও দয়া। মাথার তেলোর পুরোভাগ এই সকল ধর্ম্মভাবের স্থান—ধর্ম্মভাবের আধিক্য হইলে ঐ অংশ দীর্ঘ ও উচ্চ হইয়া থাকে; এবং উহার স্বল্পতা হইলে ঐ অংশ নীচু হয় ও ক্রমবক্র না হইয়া যেন হঠাৎ নাবিয়া গিয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধি-মিশ্র ভাব এইগুলি;—যথা, নির্ম্মিৎসা অর্থাৎ নির্ম্মাণ করিবার প্রবৃত্তি—হস্তনৈপুণ্য ইত্যাদি; ভাবুকতা বা সৌন্দর্য্যানুরাগ; অনুচিকীর্ষা অর্থাৎ অনুকরণ করিবার ইচ্ছা এবং জিহসিষা অর্থাৎ হাস্যপ্রিয়তা। ইহার কিয়দংশ কপালের পার্শ্বদেশে ও কিয়দংশ সাম্‌নেকার মাথার তেলোর পার্শ্বদেশে অব-স্থিত।

এই সকল বৃত্তির আধিক্য হইলে মস্তকের ঐ অংশ চওড়া ও পরিপুষ্ট বলিয়া মনে হয়—এবং উহাদের স্বল্পতা হইলে ঐ অংশ চ্যাপ্‌টা ও সংকীর্ণ দেখায়।

প্রত্যক্ষজ্ঞান এইগুলি যথা:—বস্তুবোধ, আকার-বোধ, পরিমাণ-বোধ, ভার-বোধ, বর্ণ-বোধ, শৃঙ্খলা-বোধ, সংখ্যা-বোধ ও স্থান-বোধ। এই সকল বৃত্তির দ্বারা বস্তুর বস্তুত্ব ও বিবিধ ভৌতিক গুণ আমাদের উপলব্ধি হয়। কাজকর্ম্মের সময় এই সকল জ্ঞান বড়ই আমাদের সহায়তা করে। এই সমস্ত জ্ঞানের আধিক্য হইলে কপালের নিম্নদেশ অর্থাৎ যেখানে ভুরু থাকে সেই স্থান বাহির-করা ও ঝোঁকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ-

জ্ঞান—এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর জ্ঞান আছে যাহাকে বিমিশ্র প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ উহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। বিমিশ্র প্রত্যক্ষ জ্ঞান এইগুলি;—যথা, ঘটনা-বোধ বা স্মৃতি, কাল-বোধ, স্বর-বোধ, ভাষা-শক্তি অর্থাৎ কথার দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তি; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কপালের মধ্যভাগে অবস্থিত। এই জ্ঞানের আধিক্য হইলে কপালের মধ্যভাগ ফুলিয়া উঠে—এবং লাঘব হইলে ঐ স্থান বসা-বসা দেখায়। বুদ্ধিবৃত্তি দুইভাগে বিভক্ত। যথা অনুমিতি অর্থাৎ কার্য্য হইতে কারণ অনুমান করিবার শক্তি ও উপমিতি অর্থাৎ বিবিধ পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ ও সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপলব্ধি করিবার শক্তি। বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্য হইলে কপালের উপরাংশ উচ্চ, প্রশস্ত, ও বহির্ম্মুখ হইয়া থাকে।

মাথার পশ্চাদ্ভাগে সামাজিক ও গার্হস্থ্য প্রবৃত্তির স্থান; মাথার তলদেশে স্বার্থ-প্রবৃত্তির স্থান; মাথার তেলোদেশে ধর্ম্মবৃত্তির স্থান এবং কপালে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির স্থান। এই সকল বৃত্তির বিভিন্ন মাত্রা ও সংযোগফলে ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রগত পার্থক্য উৎপন্ন হয়। যাহার মস্তকের পুরোভাগ অপেক্ষা পশ্চাদ্ভাগ বড়, মোটামুটি বলিতে হইলে, জ্ঞান অপেক্ষা তাহার ভাবাংশ সমধিক প্রবল। যাহার মস্তকের তেলোদেশ অপেক্ষা তলদেশ ও পার্শ্বদেশ বড়, তাহার স্বার্থ প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল ও ধর্ম্মবৃত্তি ক্ষীনভাবাপন্ন। কার্য্যে তাহার খুব উদ্যম, উৎসাহ কিন্তু তাহা সৎপথে নিয়োজিত না হইতেপারে। ইহার বিপরীতে,যাহার মস্তকের তলদেশ অপেক্ষা তেলোদেশ বড়, তাহার ধর্ম্মভাব প্রবল কিন্তু কার্য্য করিবার উদ্যম উৎসাহ কম অর্থাৎ তাহার চালকবৃত্তি অপেক্ষা নায়কবৃত্তি প্রবল।

যাহার স্বার্থ-প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই খুব প্রবল কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ততটা প্রবল নহে সে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বটে, কিন্তু সংগ্রামে সে অনেক সময়েই পরাভূত হয়; তাহার জীবনে অসঙ্গতি লক্ষিত হয়; কখন মনে হইবে লোকটা বড়ই প্রবৃত্তির বশীভূত, কখন মনে হইবে বেশ ধর্ম্মিষ্ঠ। কিন্তু ঐ সঙ্গে যাহার বুদ্ধিবৃত্তিও বলবতী, তাহার জীবনে এরূপ অসঙ্গতি লক্ষিত হয় না। যাহার স্বার্থ-প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল অথচ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দুর্ব্বল, তাহার মানসিক শক্তিসমূহ কার্য্যকরী ও উদ্যমবিশিষ্ট হইলেও তাহার নৈতিক চরিত্র জঘন্য—তাহার সমস্ত বুদ্ধি উদ্যম কুপথে চালিত হয়।

যাহার বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা প্রত্যক্ষবৃত্তি অধিক প্রবল তাহার মনভাণ্ডার বিবিধ বিষয়ের তথ্যে পরিপূর্ণ—তাহার জ্ঞানস্পৃহা অতীব বলবতী—সহজেই সে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে, খুটিনাটি করিয়া দেখিবার শক্তি তাহার বিলক্ষণ থাকে—কাজকর্ম্মের ব্যবহারিক বুদ্ধি তাহার সমধিক প্রবল কিন্তু তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, গভীরতা, ও উদ্ভাবনী শক্তির অভাব। কাজকর্ম্মে বেশ দক্ষ কিন্তু কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিতে সে সহজে পারে না এবং যে সকল কার্য্যে বহুলতা ও জটিলতা আছে সে সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধানতা তাহার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। লোকটা গুণী হইতে পারে, পণ্ডিত হইতে পারে কিন্তু কোন বিষয়ের গভীর চিন্তা তাহার দ্বারা হইয়া উঠে না—কোন বিষয়ের মূলতত্ত্ব সে ভাল বুঝিতে পারে না। যাহার কপালের নিম্নাংশ অপেক্ষা উপরাংশ বড় অর্থাৎ যাহার প্রত্যক্ষবৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল তাহার দর্শনশক্তি অপেক্ষা চিন্তাশক্তি বলবতী—

তথ্য অপেক্ষা তত্ত্বেরদিকে তাহার অধিক টান্। কোন বিষয়ের খুটি-নাটি দেখিতে তাহার ভাল লাগে না—সকল বিষয়ের মূলতত্ত্ব জানিয়াই সে সন্তুষ্ট; পদার্থের গুণাগুণ অপেক্ষা পদার্থ সমূহের সম্বন্ধ নির্ণয়ে তাহার অধিক অনুরাগ; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অপেক্ষা যে-সকল বিজ্ঞান বিশ্লেষণ ও প্রমাণ সাপেক্ষ তাহারই অনুশীলনে তাহার অধিক প্রীতি। যাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রত্যক্ষবৃত্তি উভয়ই বলবতী এবং দৈহিক প্রকৃতিও সতেজ তাহার বিশ্বপ্রসারিণী চৌকোষ বুদ্ধি এবং তাহার মন তথ্য ও তত্ত্ব উভয়েই সুসজ্জিত। যাহার মাথার চারিদিক বেশ সমান, যাহার সকল বৃত্তিই সমান পরিপুষ্ট, তাহার চরিত্রগত বিশেষত্ব বড় উপলব্ধি হয় না—তাহার কোন বিষয়ে আধিক্যও নাই ন্যূনতাও নাই; সে বেশ একরকম কাজ কর্ম্ম চালাইতে পারে; যেরূপ চারিদিককার অবস্থা তদনুসারে তাহার চরিত্র গঠিত হয় এবং সে নিঃশব্দে ও শান্তভাবে জীবন-পথ অতিবাহিত করে; কিন্তু যদি ঐ সঙ্গে তাহার মস্তিষ্ক বৃহদায়তন ও সক্রিয় হয় এবং অবস্থাও যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী হয়—সকল বিষয়েই সে মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে। যাহার মাথার সবদিক সমান নহে—কোন দিক বেশি, কোন দিক কম তাহার চরিত্রের খুব বিশেষত্ব উপলব্ধি হয়। যাহার আত্মসম্ভ্রম প্রবল, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি প্রবলতর এবং স্বার্থ-প্রবৃত্তি প্রবল নহে, তাহার চরিত্রে সম্ভ্রান্ত ভাব, পুরুষোচিত আত্ম-নির্ভর, উদারতা, উন্নত মহৎভাবের প্রকাশ দেখা যায়—সকল প্রকার নীচতা, ইতরামি তাহার নিকট অতীব হেয়। কিন্তু এইরূপ প্রবল আত্মসম্ভ্রমের সহিত যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তির লাঘব হয় এবং স্বার্থ প্রবৃত্তির অধিক্য থাকে তাহা হইলে সে ব্যক্তির

চরিত্রে অহংকার, উদ্ধতভাব, প্রভুত্বপ্রিয়তা, অনধিকার চর্চ্চা প্রভৃতি অপ্রীতিকর লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রবল বৃত্তিগুলি অপ্রবল বৃত্তির উপর আধিপত্য করে—চরিত্রের নেতারূপে অবস্থিতি করে। যথা;—যাহার জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা সমধিক, এবং তাহার সঙ্গে আত্মসম্ভ্রমও প্রবল, সে অপমানিত হইলে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে, নিজ স্বার্থসাধনে তৎপর হইবে—অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবে ইত্যাদি; কিন্তু তাহার যদি আত্মসম্ভ্রম প্রবল না হয় এবং দয়া ও কর্ত্তব্য-পরতা প্রবল হয় তাহা হইলে সে নিজের জন্য প্রতিশোধ লইতে বিরত হইবে—কিন্তু পরের স্বার্থরক্ষার্থ, সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, সে বদ্ধপরিকর হইবে। এইরূপ বিবিধ বৃত্তির প্রবলতা ও অপ্রবলতা হইতে চরিত্রের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

স্বরলিপি।

(শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেরিত)

হিন্দুস্থানী গান।

গৌর সারঙ্গ—তাল কাওয়ালী।

স্বজনি, মন-মোহন মুরলী মনমোহে,
স্বজনিয়া রহে না শকতু পলছন রে।
চলরি সখিয়া, বিতি যাতি রাতিয়া,
আওয়ে সোহি ননদিয়া মোরা,
মনহর লিয়ে মোরা চোরা রে।

°।+²

।০।১।২´।৩।

পা ॥ মা গা ধা পা।	মা গা রা সনা।	সা সা গা রা।
স্ব ॥ জ নি, ম ন।	মো হ ন, মু।	র লী, ম ন।
। মা গা -া পা।	মা গা সা -া। ॥	সা সা গা রা।
। মো হে — স্ব।	জ নি য়া —।	র হে না, শ।
। মা গা পা পা।	পা না ধা পা ॥	পা ধা পা র্সা।
। ক তু, প ল।	ছ ন, রে স্ব ॥	চ ল রি, স।
র্সা র্সা র্সা র্সা।	ধা -না র্সা র্রা।	র্সা না ধা পা।
। খি য়া, বি তি।	যা — তি, রা।	তি য়া, আও য়ে।
। পা -া -া ধা।	পা মা গা মা।	রা -গা -রগা -মা।
। সো — — হি।	ন ন দি য়া।	মো — — —।
। গা -া -া -া।	সা সা গা রা।	মা গা পা পা।
। রা — — —।	ম ন হ র।	লি মু, মো রা।
। পা না ধা পা ॥		
। চো রা রে, স্ব ॥		

(মায়ার খেলা হইতে)

মিশ্র ভুপালী—ছন্দ একতালা।

সখি, বহে গেল বেলা,
শুধু হাসিখেলা,
একি আর ভাল লাগে।

আকুল তিয়াষ,
প্রেমের পিয়াস,
প্রাণে কেন নাহি জাগে।
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত নব অনুরাগে।
তরল কোমল
নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি।
সে বিষাদ-নীরে
নিবে যাবে ধীরে,
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিঃশ্বাস আকুলি উঠিবে
আশা-নিরাশায় পরাণ টুটিবে
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে
সরম অরুণ রাগে॥

নসা ॥	সগা	-া	রা ।	গা	গা	গা ।	গমা	গমপা	মপমা ।				
সখি ॥	বহে,—	গে ।	ল,	বে	লা ।	শুধু,	—	হা ।					

। গাঃ	গঃ	গমগা ।	গরা	রা	রা ।	-া	-া	ররা ।	রাঃ	-গঃ	-রগমপা ।
। সি,	খে	লা ।	এ	কি,	আ ।	র,		ভাল ।	লা	—	— ।

। মগা রগাঃ -রসন্ঃ। সা গা রা। গমপা -মপমঃ গঃগা।
। গে, সখি — । ব হে গে। ল — বেলা।

। গা গপা পা। পহ্মা পা পমগা। গপা -া পা।
। আ কু ল। তি য়া ব । প্রেমে — র।

। ধা পধনা নধপা। পা ধা পধঞা। ঞধা পহ্মা পমগা।
। পি য়া স । প্রা ণে, কে । ন, না হি ।

। গঃমগঃ -রা -গমপা। মগা রা গরা॥ পা গপা পা।
। জা — —। গে, স খি ॥ ক বে, আ।

। হ্মপধা ধপা ধা। ধর্সা -া নর্সর্রা। র্রর্সা র্সা -া। ন্র্সা র্সা নর্সনা।
। র, হ বে। থাকি—তে। জী ব ন্। আঁ খি তে।

। ধা ধনা পা। ধা ধনর্সা র্সনা। ধনঃধঃ হ্মপধা -পঃহ্মপঃ।
। আঁ খি তে। ম দি র। মি ল ন্ ।

। গপা পা পা। পহ্মা পা পহ্মপা। গা পা পা। ধা পধনা -নধপা।
। ম ধু র। হ তা শে । ম ধু র। দ হ ন ।

। পা ধা ধঞা। ধঞধা পহ্মা পমা। গঃমগঃ -রা -গমপা।
। নি ত, ন। ব, অ নু। রা — —

। মগা রা গরা॥ {সা রা রা। রা গা গা
। গে, স খি॥ {ত র ল। কো ম ল

। রা গা গমপা। মপমা গা -া। গপা পা পা।
। ন য় নে। র্ জ ল্। ন য় নে।

। ধা পধনা নধা। পা -া -ধপধপা। (মগা রা গরা)।}
। উ ঠি বে। ভা — — । (সি স খি)।}

। মগা রা রা। গপা পা পা। পা পা পক্ষপা। গা পা পা।
। সি স খি। সে, বি বা। দ, নী রে । নি বে, যা।

। ধা পধনা নধা। পা ধা ধঞ্ধা। পক্ষা ক্ষপধা পঃমগঃ।
। বে, ধী রে । প্র থ র । চ প ল ।

। গমা -রা -গমপা। মগা রা গরা। পা গা গপা। পা পা ধা।
হা — —। সি স খি। উ দা স । নিঃ শ্বা স।

। ধা র্সা নর্সর্রা। র্র্সা র্সা র্সা। নর্সা র্সা না। ধা -ধঃনধঃ-পা।
। আ কু লি । উ ঠি বে। আ শা, নি। রা শা য়।

। ধা ধনর্সা র্সনা। ধনা ধপা পক্ষপা। গপা পা পা।
। প রা ণ । টু টি বে । ম র মে।

। -া পা পধপা। ক্ষা পা পা। ধা পধনা নধা। পা ধা ঞ্ধা।
। র, আ লো। ক পো লে। ফু টি বে। স র ম।

। পক্ষা পক্ষধা পমা। গমগা -রা -গমপা। মগা রা গরা॥
। অ রু ণ । রা — —। গে, স খি॥

ব্যাখ্যা।

(১) বিসর্গ ঃ অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন।

(২) { } = পুনরাবৃত্তির চিহ্ন।

( ) = পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিবার চিহ্ন।

(৩) পার্শ্ববর্ত্তী যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিবার চিহ্ন। শিরোদেশস্থ যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া আসিয়া থামিবার চিহ্ন।

আমাদের পুতুলের বিয়ে।

আফিমের ঘোরে সারা রাতটা ঝিমাইয়া ভোরের দিকে একটু গাঢ় নিদ্রা হয়। বুড়া বয়সে আফিম ধরিয়া শরীরের কিছু উপকার হোক্ আর না হোক্—বহুকালের অভ্যাস প্রাতে শয্যাত্যাগ আর এখন নাই। বেলা আটটার সময় প্রখর সূর্য্যের আলোকে এখন আমার ঘুম ভাঙ্গে। আজ সবেমাত্র নিদ্রাটা একটু গাঢ় হইয়াছে, এমন সময় সহসা আনন্দ-কোলাহলে ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম ভৈরবী রাগিণীতে বাঁশীও বাজিতেছে। বহুকাল পরে আজ প্রভাত দেখিলাম, বাঁশী শুনিয়া বহুকালের একটী স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল। সেই একদিন এমনি প্রভাতে, এমনি বাঁশীর স্বরে জাগিয়া উঠিয়া আমার পাশে যে একখানি ঘুমন্ত আধ-ঘোমটা-দেওয়া কচি মুখ দেখিয়াছিলাম, সেই মুখখানি মনে পড়িল। সহসা নিদ্রাভঙ্গজনিত আলস্যময় ভাবে তখনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলাম না। পূর্ব্ব আকাশের দিকে চাহিয়া কোলাহল শুনিতে লাগিলাম। বুঝিলাম আমাদেরই বাটী হইতে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিতেছে। আমারই নাতিনাতিনীর হাস্যধ্বনিতে, আমার মত পাড়ার লোকও জাগিতেছে। কিন্তু কিসের এত হাসি? কই আমাদের বাড়িতে তো আজকালের মধ্যে বিবাহ-উৎসব অথবা কোন মঙ্গলকার্য্য উপস্থিত নাই। আমার পুত্রকন্যাগুলির তো সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দুই বৎসর হইল সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ দিয়া, আমি ইহকালের কায হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেই অজানিত প্রবাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। যদিও আমি নির্লিপ্ত থাকিতে চাহি বটে, কিন্তু

আমার সন্তানেরা তবুও আমাকে না জানাইয়া তো কোন কায করে না। আমার জ্যেষ্ঠা পৌত্রীটি সবে আট বৎসরের, তাহার বিবাহের এখনো বিলম্ব আছে। তাহার বিবাহের ভাবনা আর আমার ভাবিতে হইবে না—ততদিনে আমার ডাক পড়িবে—অথবা কি জানি? সকলি সেই মহামায়ার ইচ্ছা!—তবে আমার আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই। এখানে আমার থাকার কোন আবশ্যকও নাই। যাহাদের সংসারে আনিয়াছিলাম, তাহাদের প্রতি যথাযোগ্য কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়াছি—তবে হে মা প্রকৃতি, আর এ অক্ষম জীবনে তোমার আবশ্যক কি?

কতবৎসর পরে আজ অরুণোদয় দেখিলাম—সেই পুরাতন আজন্মপরিচিত লাল গোলাকার সূর্য্য সহসা দেখিতে পাইলাম। সেই বাঁশী বাজিতেছে, সেই বালকবালিকার পরিচিত হাস্যধ্বনি—এ সকল ছাড়িয়া কি অনিশ্চিত, অপরিচিত অজানিত স্থানে যাইতে যথার্থই আমি ব্যগ্র হইয়াছি—না নিশ্চয় যাইতে হইবে এবং দিনও সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে জানিয়া মনকে প্রস্তুত করিতেছি?

"আরও কত ঘুমোবে—দাদামশায় ওঠো না—এমন ঘুমও তো কখনো দেখি নাই বাপু—এত গোলমালেও তোমার ঘুম ভাঙ্গলো না!" "দাদামশায় শিগ্‌গির ওঠো শিগ্‌গির ওঠো।" "আপনারা চেঁচামিচি করচিস্ কর্, বাবাকে কেন এত সকালে জ্বালাতন করতে যাচ্ছিস্।" দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকারা আমার খাটের চারিপাশে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পরে আমার কন্যাপুত্রেরা, তৎপরে বারান্দায় পুত্রবধূরাও উপস্থিত দেখিলাম। সকলেই উৎসাহপ্রফুল্লমুখে

আমাকে আনন্দের সংবাদ জানাইতে ব্যগ্র। আমি উঠিয়া বসিতেই সর্ব্বকনিষ্ঠ খোকা বলিল "দাদামছায় আদ্ আমাদেল্ পুতুলেল্ বিয়ে।" তাড়াতাড়ি মধ্যমা পৌত্রী বালা কহিল, "দাদামশায়, দাদামশায়, আজ দিদির মেয়ের বিয়ে।"

খোকা। দাদামছায় ছত্তির বিয়ে নয়, দিদির পুতুলেল্ বিয়ে।

তখন অষ্টমবর্ষীয়া দিদি আমার গলা ধরিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "হ্যাঁ দাদামশায়, আজ বাড়িতে কায, আর তুমি এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোচ্ছো ?"

আমি। ওরে বুড়ি আমার অপরাধ হোয়েছে তা মানলুম, কিন্তু কিসের কায তা তো আমি এখনো কিছু জানতেই পারি নি—ব্যাপারখানা কি রে ?

দেখিলাম দরজার পাশ হইতে ঘোমটা-দেওয়া হাস্যমাখা মুখে, শঙ্খহস্তে বধূমাতা অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন—মতলবখানা, আমার ঘুম ভাঙ্গিলেই তিনি একবার শাঁখটা বাজান্। তখন ঝম্‌ঝম্ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা "বাবা তোমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন এসেছি গো" বলিয়া এক প্রণাম করিল। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ন্ত নিকটে আসিয়া হাস্যমুখে কোপকটাক্ষে নলিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এত বল্লুম বাবাকে এত সকালে জাগাস্‌নে—তা কেউ শুন্‌বে না—আগেভাগে বাবাকে জ্বালাতন করতে এসেছে। শোন না বাবা! নলির মেয়ের বিয়ের গল্পটা শোন না।"

আমি। শুন্‌ছি বই কি, সব শুনছি—তা কাল তো কিছু শুনি নাই, আজ হঠাৎ এত সকালে, এত যোগাড় হোল কখন্ রে নলি ?

নলি। ও দাদামশায়, এসব পরামর্শ অনেকদিন থেকে

হোচ্ছে—কাল বাবাকে জেদ করে' ধরলুম যে আজ আমার মেয়ের বিয়ে হবেই হবে, তাই আজ হোল। পিসিমা, কাকিমা, কাল রাত্রে সবাই এসেছেন—আজ সকালে তোমাকে জব্দ কোরবো, তোমাকে একেবারে চোমকে দেবো বলে' কাল দাদা আর কাউকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি।

বালা। দাদামশায়, বাবা বল্লেন—এত করছিস্ তবে একটা বাজনা আনা, সকালে বেশ মজা হবে—বাবা ভাববেন আমাদের বাড়ি আবার কার বিয়ে। পিসিমারা জোর করে' তোমায় বল্‌তে দিলে না—নইলে আমি কালই সব তোমায় বলে' দিতুম।

বিনয়। দাদামশায় কেমন বাসর সাজান' হোয়েছে দেখ্‌বে চল—দেখ্‌লে তোমার আবার বিয়ে করতে সাধ হবে।

আমি। তা বেশ তো ভাই, একলা পড়ে থাকি, অমনি নলির মেয়ের বিয়ের খরচে, আমারও একটা হোয়ে যাক্ না। আর কনেরও তো ভাবনা নেই—এমন সুন্দর নলি আছে—তাই তবে হোক্—কি বলগো মা জননি, জামাই করবে কি?

আমার বাক্যের উত্তরস্বরূপে বধূমাতা সজোরে তিনবার শঙ্খধ্বনি করিলেন। "তা চল্ সব বারান্দায় চল্—তামাক খেতে খেতে, তোদের মেয়ের কোথায় বিয়ে হোল কি বৃত্তান্ত,সব শুনি।" তখন কাহাকেও কোলে লইয়া, কাহারও হাত ধরিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। জোরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল—বাজন্দারেরা জয় হোক্ বলিয়া, মাথা নাড়িয়া মহা উৎসাহে ঢোল বাজাইতে লাগিল।

বিনয় বড় ব্যস্ত—সে তাহার ছোটকাকাকে বলিল—"চল কাকা আমরা সভা সাজাইগে, এখানে মিছিমিছি থেকে কি হবে—আমাদের হাতে এখনো কত কায—আলো সব ঠিক

করতে হবে—মালা টাঙ্গাতে হবে, চল আমরা যাই।" তাহারা চলিয়া গেল।

নলি বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে—মেয়ের বিয়ের আনন্দ তাহার হৃদয়ে ধরিতেছে না—সে আনন্দের ভাগী দাদামশায়কে না করিলে তার আর সোয়াস্তি নাই—এ বৃদ্ধ কাহাকেও উচ্ছ্বসিত করিতে পারুক না পারুক, কাহারও মুখে হাসি ফোটাইতে পারুক না পারুক, এখনো ঐ নলক-পরা কোঁকড়া-চুলে-ঘেরা ক্ষুদ্র মুখের ঈষৎ হাসিতে আপনি হাসিতে পারে। ঐ মুখখানি দেখিলেই জানিতে পারি যে এখনো আমি বাঁচিয়া আছি—আমি যে একটা জড়-পদার্থ নহি—আমাতেও যে এখনো মানুষের সুখদুঃখের রেশ আছে, তাহা কেবল ঐ দুটো বড় বড় চোখ দেখিলেই অনুভব করিতে পারি। এই বৃদ্ধের জড়-ভাব পাছে বৎসদের আমোদ-উচ্ছ্বাস উৎসাহ ও চঞ্চলতায় ব্যাঘাত করে তাই আমার একটু ভাবনা হইল, মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলাম, আমিও হাসিয়া হাসিয়া গান ধরিলাম

এত ফুল কে ফোটালে!
হাসি-তরঙ্গ, মরি, কে ওঠালে!

নলির গলা ধরিয়া যখন এই গান গাহিতেছিলাম তখন দেখিলাম জয়ন্ত ছলছল নেত্রে নলির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—মুখ ঈষৎ ম্লান। গান সমাপনান্তে মেয়ের ঘর-বর কেমন হইল নলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন নলি মুখখানা ভারি গম্ভীর করিয়া বলিল "সে কথা আর কি বলিব দাদামশায়, মেয়ের কি বিয়ে হয়—যে কাল পড়েছে—ভেবে ভেবে আমার পেটের ভাত চাল হোয়ে যাচ্ছিল—তা দাদামশায় কত খুঁজে খুঁজে সইএর ছেলের সঙ্গে ঠিক করেছি। সইএর ছেলেটী এম এ পড়্ছে। তা দাদামশায়

পাঁচ হাজার টাকা নগদ আর এই মেয়েকে দুশো ভরি সোণা, খাট বিছানা, রূপোর দানসামগ্রী, ফুলশয্যায় সোণার রেকাব গেলাস দিতে হবে। সই বলে যে, আমার চার পাশ করা ছেলে, আমি কি অত অল্প টাকায় রাজী হতুম, তবে তোমার সঙ্গে ছেলে-বেলা থেকে সই পাতান—আর মেয়েটীও সুন্দর, জানা ঘর, তাই করলুম। তুমি আমার ছেলেকে নিয়ে আদর যত্ন করবে আর মেয়েকে দেওয়া তো একবারে দিলেই ফুরোয় না পাঁচবারে তখন পাঁচরকম করে দিও। সইও গায়ে হলুদ ভাল করে দেবে। মেয়েকে জড়োয়া ঝাপটা পাঠাবে পাঁচজন এয়োর পাঁচটা রূপোর সিঁদুরচুপড়ি দেবে। তা আমাদের আবার ফুলশয্যাতে রূপোর সিঁদুরচুপড়ি দিতে হবে। বাপ্‌রে! সেকালে বাপু এত ছিল না—দিন দিনই ফন্দি বাড়ছে। না জানি আরও কত হবে।"

বালা পাশে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে দিদির কথার উপর কিছু বলিবার উদ্যোগ করিতেছিল কিন্তু দিদির একটানা স্রোতে সে থই পায় নাই—দিদি থামিবামাত্রই "শোন দাদামহাশয় ওদের মিছিমিছি টাকা—পাই পয়সায় পারা মাখিয়ে টাকা করেছে। আর পুঁথির গয়নাকে জড়োয়া বল্‌ছে।"

নলি হাসিয়া বলিল, "তা দাদামশায় এ ত আর সত্যির বিয়ে নয়—তবু দাদামশায় আমি সত্যিকার রূপোর দান দেব, তবে সত্যিকার সব নেমন্তন্ন হবে—সত্যিকার লুচিটুচি সব তো হচ্ছে, কেমন দাদামশায়?"

জয়ন্ত। বাবা দেখেছ নলি আমাদের আজকাল বিয়ের পদ্ধতি, লেনাদেনা কেমন মাথার ভিতর ঠিক করে' নিয়েছে, আমি আশ্চর্য্য হয়েছি যে ও কি করে' কথাগুলো ঠিক ঠিক বলেছে, ও কোথায় শুনলে!

বাস্তবিক আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। নলি অন্য বালিকা হইতে কতকটা বুদ্ধিমতী ও অনুকরণক্ষম তা আমি জানিতাম। কিন্তু ও যে এত সংগ্রহ করিতে পারে তা জানিতাম না। "কেমনরে নলি তুই এত বিয়ের কথা জানলি কেমন করে রে।"

"কেন দাদামহাশয় বৈশাখ মাসে যখন দিদির বিয়ে হোল তখন যে বড়পিসিমা তোমাকে কত কথা বল্লেন ?"

আমার মনে পড়িল সত্য সম্প্রতি আমার দৌহিত্রীর বিবাহ উপলক্ষে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল বটে। এমন সময় ঐ বড়পিসিমা এসেছে, ঐ বড়পিসিমা এসেছে, ঐ দিদি এল, বৌমা এল, পুঁটী এল, কলরব পড়ে'গেল। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা অভয়া আসিয়াই "হ্যাঁরে জয়, টাকা রাখতে বুঝি জায়গা পাসনি তাই মিছিমিছি গুচ্ছির টাকা খরচ করতে বসেছিস্। এতই যদি সাধ তো দেখ্, মেয়ের বে দে না, হলোও তো সাত আট বৎসরের, তোর বিয়ের সাধও মিটুক আর একটা কাজও হোক্—মিছিমিছি এত টাকা নষ্ট—আজও তোর ছেলেবুদ্ধি গেল না—যেমন তুই তেমনি বৌও উড়নচণ্ডি হোয়েছে।"

সর্ব্বমঙ্গলা। কেন দিদি বেশ তো হোচ্ছে, এ মাসে কি আর আমাকে পাঠাতো—ভাগ্যি নলির মেয়ের বিয়ে হোল তাই তো আসতে পেলুম। বৌ কেমন ঠিক সত্যিকার মতন বরণডালা সাজিয়েছে কেমন সব গোছগাছ করেছে—ওবাড়ির সব আসবে কেমন আমোদ হ'চ্ছে—দিদির সবতাতেই বকুনি।

অভয়া। না তা বক্‌বো কেন, তোরা পয়সাগুলো গোলার ঘুড়ি করে' ওড়াবি আমি চুপ করে' থাক্‌বো!

জয়ন্ত। দিদি যেমন করে' হোক্‌ আমোদ হোলেই হোল। দিদি পুতুলের বিয়েতে ভাবনা কিছু নেই—খাঁটি কেবল আমোদ টুকু পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু আজ যদি নলির বিয়ে হোত দিদি তা হোলে কি এত হাসি হাসতে পারতুম—তাতে আমোদ কোথায় ভাই—মনে ক'রে দেখ দিথি দিদি এত আদরের আমাদের নলি কার হাতে দিচ্ছি তা আমরা কিছুই জানতে পারবো না—তার সুখদুঃখে নলির সুখদুঃখু, তার পরে আরও কত ভাবনা—দেখ এই এখন আমরা সবাই আছি—নলির বিয়ের সময় যে সকলেই এমনি একত্রে আমোদ ক'রতে পারবো তারি বা ঠিক কি—কার কখন ডাক পড়বে দিদি তা তো আর আমরা জানিনে আর আমাদের হাতও নয়।

অভয়া। যা যা মিছে বকিস্‌নে—তোর সব কথাতেই পোড়া কথা আসে।

সর্ব্বমঙ্গলা। তা দিদি সত্যিই আমরা তো আর আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে আসি নি—মরতে তো সবাইকেই হবে—তার কেউ আগে কেউ পরে—তাও আর পোড়া কথা কি।

আমি। ওরে বাছা আজ নলির মেয়ের বিয়ে, আজ কি ওসব অমঙ্গলের কথা বল্‌তে আছে—ওরে বাজনা বাজাতে বল্‌ না—বাজনা বুঝি চুপ করে' থাক্‌তে এসেছে।

বাজনা বাজিয়া উঠিল—নলির মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বেচারা বাবা পিসিমার গম্ভীর তর্কবিতর্ক শুনিয়া ম্লানমুখে একবার এর মুখ একবার ওর মুখ চাহিতেছিল।

অভয়া। জয়, আমার জামাইবাড়ি নেমন্তন্ন করেছিস্‌ তো? আর জামাইটিকেও আন্‌তে পাঠাও, সে ছেলেমানুষ আমোদ আহ্লাদ করবে।

জয়। হ্যাঁ দিদি তা জামাই আনাব বইকি, ছেলেরা কতদিন ধরে' পুতুলের বিয়ে বিয়ে করছে, কাল আর শুনলে না, বল্লে কালই হবে—তাই তো এখনো কাউকে বলা হয় নি।

অভয়া। হ্যাঁ ভাই জামাইবাড়ি কাউকে পাঠাও, নতুন কুটুম্ব ভাল করে' যত্ন করতে হবে। তা হোলে ভাল নলির মেয়ের বিয়ের অছিলায় জামাইটি দেখ্‌তে পাব।

সর্ব্বমঙ্গলা। আঃ এতক্ষণে দিদির মুখে হাসি দেখা গেল—জামাই জামাই করেই দিদি সারা হয়ে গেল—পরের ছেলেকে অত কেন গা ?

অভয়া। ওরে তোর যখন হবে তখন বুঝবি। এখনো মেয়ে হয়নি তার জামাই।

সর্ব্বমঙ্গলা। আমার মেয়ের আমি বিয়ে দেবই না—মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে ঘরে ছেলের মত রাখ্‌বো। বাবা! মেয়ের বিয়ে দিতে যে খোসামোদ করতে হয়—আমি অত পারবো না।

অভয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও অমন এককালে কত কি বলতুম তার পর যাই সত্যি কাযের সময় এল—তখন যে-কে-সেই।

জয়ন্ত। দিদি, নলি কেমন গিন্নিপনা করে' বাবাকে বিয়ের সব খবর দিলে যদি শুন্‌তে তো অবাক্ হোতে। মমতাময়ীর বিয়ের সময় আমরা সব কথাবার্ত্তা কইতুম, সেই সব শুনে কেমন গুছিয়ে মনে রেখেছে।

"সে কিরে, আমরা তো কই কখনো দেখি নি যে নলি আমাদের কথা মন দিয়ে শুন্‌ছে! ওঁর বড় বুদ্ধি—বেঁচে থাকেন তো যার ঘরে যাবেন তার ঘর উজ্জ্বল হবে।"

"দিদি এস চল বৌদিদি ডাক্‌ছেন—কেমন কুলো বরণডালা

সাজান' হোয়েছে, দেখ্‌বে এস। চল নলি, বাবাকে সব এনে আমরা দেখাই।"

আমি। তোরা সব যা, মুখটুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে দেয়ে আয়—আমিও আফিমটা খেয়ে গায়ে বল করে' নিই। আজ বড় খাটুনি মাথার উপর।

"ওগো কনের দাদা, আজ দু'সের দুধে হবে না—আজ দু'হাঁড়িছ ক্ষীর চাই।"

"তা বাবা আমায় বলা কেন—কনের মা ত তোমার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে বল।"

"হাঁ হাঁ ওঁর কাছে দু'হাঁড়ীতে হবে না—ওঁর কাছে, পাঁচ হাঁড়ী।"

নলি। বল কি দাদামশায় তা হ'লে কেমন করে' কুলোবে, বাবা যে সবেমাত্র আট হাঁড়ি বই ক্ষীর ফরমাস্‌ দেন নি—তা হ'লে কেমন করে' হবে দাদামশায়—তুমি আর একদিন বেশি করে' খেও; আজ দাদামশায় বেশি খেও না।

জয়ন্ত। এইবার নলি জব্দ হোয়েছে, যা তোর আর ভাবতে হবে না—যাতে কুলোয় তাই হবে এখন। * * *

মহা সমারোহ। জামাই, নাতজামাই ভ্রাতৃবধূ সকলেই ক্রমে ক্রমে আসিলেন, সকলেরই হাসিমুখ সকলেই আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। বরণের সময় বধূমাতা নলির পার্শ্বে আমাকে দাঁড় করাইয়া আমাদের দুই জনকে বরণ করিলেন। কন্যাসম্প্রদানের সময় আমার দৌহিত্রী অমরাবতী আমাকে কন্যার পিতাস্বরূপে ধরিয়া লইয়া গিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইল—কারণ নলির মেয়ে বটে, কিন্তু মেয়ের বাপের সম্পূর্ণ অভাব। আমাকে কেহ মালা পরায়, কেহ চাদর পরায়,

তাতে বড় হাসি। দেখিলাম জয়ন্ত হাসিয়া হাসিয়া বন্ধুদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছে—নানারূপ হাস্যপরিহাসও চলিতেছে। বাসর-ঘরে গানবাজনাও হইতেছে—বিনয় দু'একটী গান জানে।

অনেক রাত্রে উৎসব শেষ হইলে আলোগুলি একে একে নিভিয়া আসিল,জনকোলাহল ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, আমিও শ্রান্তভাবে বিছানায় পড়িলাম—আমাকে যে কাজ করিতে হইয়াছিল তাহা নহে—আমাকে যে আগ্রহ দেখাইতে হইয়াছিল, আমাকে যে হাস্যপরিহাস করিতে হইয়াছিল, আমাকে যে নিয়মিতাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাক্যব্যয় করিতে হইয়াছিল—তাহাতেই আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আমি প্রতিদিন এক নিয়মেই কাটাই। নিয়মিত স্নানাহারের পর নলির হাতে মাথাটী সমর্পণ করিয়া দুপুরবেলা একটু নিদ্রা দিই। বৈকালে উঠানে ছেলেরা খেলা করে, চাহিয়া চাহিয়া দেখি—সন্ধ্যায় তাহারা ক খ গ ঘ পড়ে, নানারূপ ঝগড়াঝাঁটি করে, পাশের ঘর হইতে তাহা শুনি—পুত্রেরা আসিয়া দেশের সংবাদ কহেন তাহার দু'একটী উত্তর প্রত্যুত্তর করি। রাত্রে বধূমাতারা যখন তাঁহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া আহার করা-ইতে আসেন তখন তাঁহাদের খবরাখবর লই ও তাঁহাদের পিতামাতাকে উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সন্তানসন্ততিদের লইয়া কিঞ্চিৎ রহস্যালাপ করিতে করিতে আহার শেষ করিয়া প্রশান্তচিত্তে ঘুমাইতে যাই। ইহার অধিক মনের উচ্ছ্বাস বা শরীরের বল আমার নাই।—ভাবিতে ভাবিতে জয়ন্তের কথা মনে পড়িল। বাস্তবিক আজ যদি নলিনীর বিবাহ হইত তো কত ভাবনা হইত। মনে আছে নিজের এক একটী

মেয়ের বিবাহ দিতাম আর তাহার পূর্ব্বে ও পরে কত ভাবনা হইত। এক্ষণে মন জড় হইয়া গিয়াছে এবং হাতে ক্ষমতা না থাকিলে মনের সকল ভাবই শমিত হইয়া আসে তাই আর সে সকল ভাবনা তত তীব্রভাবে নাই। হায়, আমার মধ্যমা কন্যা যখন স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া ম্লানমুখে বেড়াইত তখন আমার কি করিতে না ইচ্ছা করিত? যত ভালবাসা দিলে সেই মুখে হাসি ফুটে আমি তাহাকে যে সকলি দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু পিতার স্নেহে যে সে ম্লানমুখে হাসি ফুটিবার যো নাই। সে যে ক্রমে প্রস্তরবৎ হইয়া আসিল—আমি দেখিলাম আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। মাগো মহামায়া যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন মা! বুড়া হইয়া মরিতে চলিলাম তবু তোর রহস্য বুঝিতে পারিলাম না!

পরদিন ছপুর বেলা পাকাচুল তোলাইবার সময় নলির খোঁজ করিলাম—বালা আসিয়া বলিল "দিদির মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছে তাই দিদি কাঁদছে,দিদি আসবে না।" শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না—নলির চক্ষে জল পড়িতেছে হায় কেন!—গিয়া দেখিলাম নলি কাঁদিতেছে—জয়ন্ত তাহাকে কোলে করিয়া বুঝাইতেছে "এই বুঝি তোমার বুদ্ধি আছে—পুতুলের জন্ত এত কান্না! তোমার অত পুতুল আছে একটা গেলই বা, অমনি পুতুল আবার হবে।"

কিন্তু নলির চক্ষের জল থামে না। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া বুকের কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছে, তাই কাঁদছিস্ নলি?" সে মুখ ফুলাইয়া কহিল 'হুঁ'। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রিজাগরণে কাতরা নলি ঘুমাইয়া পড়িল। উৎসব-কোলাহলান্তে বাটী নিস্তব্ধ হইয়াছে—সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছে—

আমারও স্বাভাবিক জড়ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে—কিন্তু মনের আজ বিশ্রাম কই ?

নলি পুতুলের বিবাহ দিয়াছে, বলিতেছে, মিছামিছি মেয়ে—বলিতেছে মিছামিছি বিবাহ দিলাম। কিন্তু কাঁদিতেছে সত্য। কিন্তু সত্য কোথায় ? এই যে আমরা মানুষ বলিয়া নিজেরা অহঙ্কার করিয়া থাকি আমাদের মানুষত্ব কোথায় ? নলির পুতুলকে নলি যেমন করিয়া নাড়েচাড়ে, যথা-ইচ্ছা তাহার প্রতি ব্যবহার করে, এমনি আমরাও কি এক আমাদের অজানিত কাহারও পুত্তলিকামাত্র নহি ? সেই কন্যা কি তাঁহারই ইচ্ছা-মত আমাদের পরিচালিত করিতেছেন না ? নলিও কি একটা পুতুল নহে ? কে নলিকে হাসায়, কে কাঁদায় ? মা, কে তুমি এই অনন্তকাল ধরিয়া এই সকল পুত্তলিকা লইয়া অনন্ত খেলা খেলিতেছ—কবে তোর বাল্যকাল ঘুচিবে, কবে তোর এ খেলা সাঙ্গ হইবে! ভাল, এই আমরা যে তোর পুতুল, আমাদের জন্যে কি কখনো তোর প্রাণ কাঁদে ? নলির পুতুল ভাঙ্গিলে নলি কাঁদে, নলির মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল, নলি কাঁদিতেছে। কিন্তু তোর যে প্রতিদিন শত শত পুতুল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে তাহাতে কি তোর চক্ষে এক ফোঁটা জল পড়ে ? যখন তুই তোর শত শত পুত্তলিকাকে পুত্রশোকে কাতরা করিয়া কাঁদাইয়া আকুল করিয়া তুলিস তখন সে খেলায় তোর কি সুখ হয় একবার আমায় বল্ দেখি। তোকে জানি না, তোকে ত দেখিতে পাই না—কিন্তু তোর খেলা দেখিতে পাই। কোথায় তুই কি সুখে থাকিস্ তাই এই নিদারুণ খেলা খেলিস্ একবার আমায় বল্। না গো মা—জানি তা তুই বলিবিনে, তোর খেলা তুই বুঝি অনন্তকালই খেলিবি—তা খেল্, কেবল এই কথাটি শোন্ এই ভাঙ্গা পুতুলটা

নিয়ে আর খেলিসনে—এই প্রেমহীন বাসনাহীন জীর্ণ শার্ণ পুতুল-টাকে ফেলে দে—ভাঙ্গাপুতুল আর ভেঙ্গেভেঙ্গে খেলা করিসনে।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

মধ্য আসিয়ায় রুষ।

কিছু দিন হইল সংবাদ আসিয়াছে রুষ সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল য়ানক্ সৈন্যসামন্ত লইয়া অক্ষসতীর হইতে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। এই সংবাদে আফগানিস্থানের আমীর ভীত হইয়াছেন; ইংরাজও নিশ্চিন্ত নহেন। এইসময়ে মধ্য আসিয়ায় রুষের গতিবিধি সম্বন্ধে দুই এক কথা বোধ হয় পাঠকদের অপ্রীতিকর হইবে না।

রুষ মধ্য আসিয়ায় রাজ্যপ্রসারণ ও সৈন্যসঞ্চালনে এত ব্যস্ত কেন? উদ্দেশ্য কি? রুষ নিজে বলেন, বাণিজ্যস্থাপন এবং অনাবিষ্কৃত স্থানসমূহের আবিষ্কার ব্যতীত আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে ইংরাজ রাজনীতিবিদ্দিগের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয়। একশ্রেণীর ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞের দৃঢ় বিশ্বাস যে রুষের ভারত আক্রমণে কোন অভিলাষ নাই। আর একশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ রুষের অর্থাভাব, আমীরের সহিত ইংরাজের বন্ধুত্ব এবং ভারতবাসীর অকপট রাজভক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত। আর এক শ্রেণী রুষভয়ে একান্ত ভীত। সময়ে অসময়ে ইঁহারা ঈশপ্-রচিত গল্পের বালকের মত "ঐ রুষ, ঐ রুষ" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। লর্ড

এলেনবরার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সমভাবে সমস্বরে আপনাদের ভীতিগ্রস্ত মনের পরিচয় দিতেছেন। বলা বাহুল্য ভারতে এই শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞের প্রাধান্য কিছু বেশী। এই শ্রেণী অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছেন—নিষ্ফল আফগান যুদ্ধের মূল ইঁহারাই; ভারতে সৈন্যবৃদ্ধি ইঁহাদেরই জন্য; ইঁহাদেরই উত্তেজনায় আজিও গবর্মেণ্টকে উত্তরপশ্চিম প্রান্তে অনাবশ্যক দুর্গাদি নির্ম্মাণার্থে অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইতেছে। ইঁহাদের উৎপাত না থাকিলে আজ বাটার দায়ে গবর্মেণ্টকে এতটা বিব্রত হইতে হইত না।

গত জুলাইমাসের নাইণ্টীন্থ্ সেঞ্চুরিতে আরমিনিয়স্ ভ্যামবরি সাহেব মধ্য আসিয়ায় রুষের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে যে তিন শ্রেণীর রাজনীতিবিদ্দিগের কথা বলিয়াছি, প্রবন্ধলেখককে ঠিক তাহার কোন একটি শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না বটে, কিন্তু তাঁহাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী এক শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। প্রবন্ধলেখক রুষের বাক্যে আদবেই বিশ্বাস করেন না; বরং ১৮৮৭ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মধ্য আসিয়ায় রুষের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে, ভারত আক্রমণ ব্যতীত রুষের আর দ্বিতীয় অভিপ্রায় নাই। ১৮৮৭ সালে সীমা-কমিশন সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে রুষ-সম্রাট প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কোন ক্রমেই রাজ্যের সীমা-রেখা অতিক্রম করিবেন না। ভ্যাম্বরি সাহেব বলেন যে যদিও সম্রাট স্বয়ং প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন নাই, তথাপি জেনারেল কোমারফের পরিবর্ত্তে জেনারল কুরোপাতকিন্‌কে ট্রেনস্‌কাস্পিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া উক্ত প্রতিজ্ঞাভঙ্গের

উপায় করিয়া দিয়াছেন। নূতন শাসনকর্ত্তা কুরোপাতকিন্ ইংরাজের চিরশত্রু। ইনি ১৮৭৬ সালে কাশ্‌গরে আসিয়া ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। পুলিখাতুম হইতে অক্ষস পর্য্যন্ত যে সীমারেখা আছে, ইনি সেই সীমারেখা অতিক্রম করিয়া রুষাধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস পাইতেছেন। খোরাসন প্রদেশ হইতে ভারত আক্রমণের সুবিধা হয়, এই জন্য কুরোপাতকিন্ রুষসীমার নিকটস্থিত পারস্যপ্রদেশসমূহ হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আফগানদিগের মধ্যে বিদ্রোহানল জ্বালাইয়া দিবার ইচ্ছা ইঁহার হৃদয়ে বলবতী।

পাঠক দেখিবেন, ভ্যামবরি সাহেব নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, রুষসম্রাট প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনের কোন কার্য্য আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। কুরোপাতকিনের মনে যাহাই থাকুক রুষসম্রাটের অনভিমতে তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। কুরোপাতকিন্ কার্য্যতঃ আমীরের বা পারস্যসম্রাটের বিপক্ষতাচরণ করিলে অবশ্যই তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান করিতেন। সার পিটর ল্যামস্‌ডান প্রমুখ সীমা-কমিশনের নির্দ্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করিবার চেষ্টা দেখিয়া ইংরাজও নিশ্চিন্ত থাকিতেন না।

ভ্যামবরি সাহেব বলিতেছেন, রুষ কেবল উত্তরদিক হইতে ভারত আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন এমন নহে, পূর্ব্বদিক হইতে রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল য়ানফ্ এইরূপ চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। পামীর হইতে গিল্‌গিট হইয়া কাশ্মীরে পৌছিবার এক সহজ পথ আবিষ্কার জন্য ইনি বড়ই ব্যস্ত। পামীরে ইংরাজের অবস্থিতি ইঁহার সহ্য হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি ইংরাজ কর্ণেল ইয়ংহজ্‌ব্যাণ্ড ও ডেভিডসন্‌কে পামীর হইতে বহি-

কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ণেল য়ানফ্ সৈন্যসামন্ত লইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধ লিখিবার সময় সে সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলে বোধ হয় তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিতেন। সম্প্রতি কিন্তু সংবাদ আসিয়াছে রুষসম্রাট কর্ণেল য়ানফের এই হঠকারিতার জন্য বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। রুষসম্রাট তারযোগে কর্ণেল য়ানফ্কে ভর্ৎসনা করিয়াছেন এবং শান্তিভঙ্গের কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইংরাজ যে রুষের বন্ধু, সম্রাট য়ানফ্কে এই কথা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। এই নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিয়া সম্রাট যে আপনার সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন ভ্যামবরি সাহেবকেও বোধ হয় তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এই সময়ে আমীরের সহিত ইংরাজের সদ্ভাব বজায় রাখা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা সকলেই স্বীকার করেন। বর্ত্তমান আমীর আব্দুর রহমন্ ইংরাজের নিকট বিশেষ উপকৃত এবং তিনি ইংরাজের বিশেষ বন্ধু বলিয়াও পরিচিত। ভ্যামবরি সাহেবের আমীরের উপর তাদৃশ বিশ্বাস নাই; আমীর যে ইংরাজের আন্তরিক বন্ধু একথা তিনি স্বীকার করেন না। ভ্যামবরি সাহেব যে ভারত গবর্মেণ্টের আফগান-নীতির সুখ্যাতি করিয়াছেন, সেই ভারত গবর্মেণ্টের আমীরের উপর কতকটা বিশ্বাস আছে বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বাসের অভাব হইলে ভারত গবর্মেণ্ট আমীরকে সন্তুষ্ট করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইতেন না। আমীরের বন্ধুত্ব বজায় রাখিবার একমাত্র উপায় আমীরের স্বরাজ্য শাসননীতির উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করা।

মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞদিগের এই মত। ভ্যামবরি সাহেবের উপদেশ কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত।

ছয় বৎসর ধরিয়া ভারত গবর্মেণ্ট উত্তরপশ্চিম সীমা সংরক্ষণার্থে যে সকল কার্য্য করিতেছেন, ভ্যামবরি সাহেব সেই সকল কার্য্যের কেবলমাত্র সুখ্যাতি করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই— তিনি ইংরাজকে ইংরাজ রাজ্যের বর্ত্তমান সীমা অতিক্রম করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, রুষ যেমন পশ্চিমে পারস্য-রাজ্যভুক্ত খোরাসন বা তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ দখল করিবার অভিপ্রায়ে আছেন, ইংরাজ তেমনি পারস্যপ্রদেশস্থ সিস্তান দখল করুন। সিস্তান ইংরাজের হস্তগত হইলে রুষ কোন ক্রমেই খোরাসন হইতে ভারতসীমায় আসিতে পারিবেন না। রুষ পামীর দখল করিয়াছেন; গিলগিটের মধ্য দিয়া কাশ্মীর আক্রমণ করা রুষের আর এক উদ্দেশ্য। ভ্যামবরি সাহেব বলেন, কাশ্মীরের উত্তরস্থ হানজা ও নাগর প্রদেশ ইংরাজ স্বরাজ্যভুক্ত করিলেই রুষের এ পথও বন্ধ হইবে।

ভ্যামবরি সাহেব রুষ সৈন্যাধ্যক্ষ কুরোপাতকিন্‌কে রুষ সীমারেখা অতিক্রমের চেষ্টা করিবার অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন। তিনি কি করিয়া ইংরাজকে ঠিক সেই অপরাধ করিতে উত্তেজিত করিতেছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস ইংরাজ যতদিন ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, ততদিন ভ্যামবরি সাহেবের এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত হইবে না।

প্রবন্ধের উপসংহারে ভ্যামবরি সাহেব ভারতবাসীর রাজভক্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে রুষের ভারতজয়ের আশা একান্ত দুরাশা। আমরা ভ্যামবরি সাহেবের এই কথার

সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। দুঃখের বিষয় আমাদের রাজপুরুষগণ ভারতবাসীর রাজভক্তির উপর তেমন বিশ্বাস করেন না— নহিলে অস্ত্র-আইনের আবশ্যক কি এবং বাঙ্গালীকে ভলন্টিয়ার করিতে এত অনিচ্ছা কেন ?

কি রূপে গল্প তৈরি হয়।

"মন্থ্‌লি প্যাকেট্‌" নামক বিলাতী মাসিক পত্রের জুলাই সংখ্যার "কিরূপে গল্প তৈরি হয়" এই নামের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে ১৫ জন খ্যাতনামা উপন্যাস-লেখকের মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক তাঁহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান, তাঁহারা সেই সকল প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন, সেই উত্তরগুলিই ঐ প্রবন্ধে সমালোচিত হইয়াছে।

প্রথম প্রশ্ন ;—"গল্পের বীজাণু অথবা গল্পের মূল-বীজটি কি ? কোন গল্প যখন লেখা হয়, তখন সেই গল্প ছবির আকারে, না অবস্থার আকারে, না সমস্যার আকারে, না অন্য কোন আকারে মনোমধ্যে প্রথমে উদয় হয় ?"

ইহার উত্তরে ৫জন উপন্যাস-লেখক বলেন যে, সর্ব্বপ্রথমে সংকটাবস্থায় পতিত একটি কিম্বা কতকগুলি কাল্পনিক নায়ক তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রথমে উদয় হয়—এই সংকট-সমস্যাটি কিরূপে পূরণ করা যাইবে প্রসঙ্গক্রমে আপনা-আপনিই তাহার উপায় মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। আর চার পাঁচ জন উপন্যাস-লেখক বলেন, প্রথমে একটি সমস্যা তাঁহাদের মনে উদয় হয় এবং এই সমস্যা হইতে প্রসঙ্গক্রমে পরে বিবিধ চরিত্র-নায়ক তাঁহাদের মনে

আইসে। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, এই কাল্পনিক ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র অথবা কোন সমস্যা দৈবাৎ কাহারও কোনও কথা শুনিয়া, বা কাহারও মুখ দেখিয়া, কোন কবিতা বা প্রবচন পাঠ করিয়া মনে স্বতঃ উদয় হয়। তিনজন স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যে, কোন বাস্তবিক স্থান-বিশেষ বা দৃশ্য-বিশেষ দেখিয়া গল্পের বিষয় তাঁহাদের মনে আপনা-আপনি উদয় হয়। একজন বলেন, হঠাৎ কোন কল্পিত দৃশ্য মনোমধ্যে উদয় হয়—কেন উদয় হইল তাহার কোন কারণ আপাততঃ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, হয়তো কিছু কাল পরে তাহার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন;—"গল্পের প্রারম্ভটা আপনা-আপনি সহজে আইসে, না চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়?"

প্রায় ২৪ জনই উত্তরে বলিয়াছেন—"হাঁ"। এই উত্তর হইতে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে কখন বা চেষ্টা করিয়া আরম্ভ করিতে হয়, কখন বা আরম্ভটা সহজে আপনা হইতে আইসে।

তৃতীয় প্রশ্ন;—"গল্পটি লিখিবার আগে মনে মনে সমস্তটাই কি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়—না,লিখিতে লিখিতে ক্রমশঃ উহা বিকশিত হইয়া উঠে?" চারিজন বলিয়াছেন, সমস্ত গল্পটা আগাগোড়া মনে মনে ঠিক্ করিয়া লওয়া হয়—কিন্তু আর কয়েক জন ভিন্নরূপ উত্তর দিয়াছেন। একজন লেখক বলেন, গল্পের কল্পিত নায়কেরাই সমস্যাটি পূরণ করে। কখন কখন কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ কল্পিত দৃশ্য তাহাদের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হয়, কখন বা সমস্ত গল্পটাই আগাগোড়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করা হয়। আর একজন লেখক বলেন, ত্রিরাশি অঙ্কের ন্যায় সমস্যাটি আপনি পূরণ হইয়া আইসে। গল্পের প্রধান নায়কগুলি এবং গল্পের অবস্থা ও পরিণাম যদি পূর্ব্ব হইতে স্থির থাকে, তাহা

হইলে অন্তর্বর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও উপনায়কগুলির চরিত্র আপনা-আপনি বিকশিত হইয়া উঠে।

চতুর্থ প্রশ্ন ;—"যে রচনা চেষ্টা করিয়া করিতে হয় এবং যে রচনা আপনা-আপনি সহজে হয় এই উভয়ের মধ্যে রচনার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে কোন প্রভেদ উপলব্ধি হয় কি না ?"—এই প্রশ্নের যে সকল উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে অনিচ্ছাপূর্ব্বক জোর করিয়া গল্প লিখিতে বসিলে তেমন সুবিধা হয় না।

"গল্পের চরিত্র বর্ণনা দেখিয়া লেখকের চরিত্রের আভাস পাওয়া যায় কি না ?" এই প্রশ্নের উত্তরে একজন এইরূপ বলিয়াছেন ;—যে চরিত্র হৃদয়ের সহিত অঙ্কিত করা হয়, যে চরিত্রে লেখকের মমতা প্রকাশ পায় সে চরিত্র লেখকের অনুরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।

"বাস্তবিক লোক-সমাজ হইতে তাঁহাদের গল্পের নায়ক সকল গৃহীত হয় কি না ?" অনেকেই এই প্রশ্নের সোজা উত্তর দেন নাই—একটু রঞ্জিত করিয়া বলিয়াছেন। একজন এই বলিয়াছেন যে, বাস্তব ঘটনারাশি হইতে কোন নায়ক নির্ব্বাচন করিয়া কল্পিত ঘটনার মধ্যে যদি তাহাকে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে সেই পাত্রের চরিত্র তেমন স্বাভাবিক হয় না।

যাহা হউক, ১৫ জন উপন্যাস-লেখকের উত্তর হইতে এইটুকু সারসংগ্রহ করা যাইতে পারে যে, গল্প লিখিবার দুইটি প্রধান উপাদান—প্রথমতঃ—বিবিধ কল্পিত চিত্র মনোমধ্যে সহজে উদয় হয় এরূপ কল্পনা-শক্তি লেখকের থাকা চাই—দ্বিতীয়তঃ সেই কল্পিত চিত্রগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া বেশ পরিপাটীরূপে কারিগুরি সহকারে প্রকাশ করিবার শক্তি থাকা চাই।

বুদ্ধচরিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কপিলবস্তুর স্থান নির্ণয় এবং শাক্যবংশাবলী।

কপিলবস্তু অনেককাল হইল ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ এখন কেবল ভূমি খনন করিলে পাওয়া যায়। চীন দেশের পর্য্যটকেরা যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহারা এই নগরের ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিয়াছিলেন। তাহার পর সহস্রাধিক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখন সেইস্থানে পূর্ব্বকালের শাক্যমহিমার একটি চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে কার্লাইল সাহেব ফাইজাবাদ হইতে যাত্রা করিতে করিতে হঠাৎ কপিলবস্তুর পূর্ব্বস্থান আবিস্কার করিলেন। তৎসম্বন্ধে তিনি যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে একটি অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। উক্ত নগর যে স্থানে স্থাপিত ছিল তাহাকে এখন ভুইলা গ্রাম বলে। ভুইলা একটি হ্রদের উপর স্থিত, তাহাকে ভুইলাতাল বলে। উহার অনতিদূরে একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে এখনও দেখা যায়। বুদ্ধের সময়ে তাহাকে রোহিণী নদী বলিত। ভুইলার চতুর্দ্দিকে খনন করিতে করিতে চীন-পর্য্যটক হিউন সাঙ যেসকল স্তূপ, বিহার এবং অট্টালিকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তৎসমূহের ভগ্নাবশেষ ঠিক সেই সেই স্থানে লক্ষিত হয়। এই ভুইলা অর্থাৎ কপিলবস্তু ফাইজাবাদ অর্থাৎ অযোধ্যার ১২॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বদিকে, বস্তি হইতে ৭॥০ ক্রোশ উত্তর এবং কাশী হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ উত্তরে। ইহা উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চলের বস্তিবিভাগের মনসুরনগর পরগণার মধ্যে স্থিত। কুশিনগর হইতে কুমাউন পর্য্যন্ত যতটা বিস্তৃত দেশ দেখিতে পাওয়া যাইত শাক্যজাতি দ্বারা তখন তাহা পূর্ণ ছিল। শাক্যেরা অনেক কাল ধরিয়া এদেশের ক্ষত্রিয়জাতি ছিল। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে মগধরাজ নন্দ পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ক্ষত্রিয়দিগের তেজ এবং বীর্য্য হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং যখন ক্ষত্রিয়েরা পরাস্ত হয় তখন দেশ রক্ষা করিবার জন্য বোধ হয় শাক্যেরা ক্ষত্রিয়দিগের স্থান অধিকার করিয়াছিল। পরে শাক্যজাতিও হীনপ্রভ হয়। খৃীঃ অব্দের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া "শকারি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর রাজপুতজাতিরা ক্ষত্রিয় বলিয়া ভারতে গণ্য হইতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষে জাতিভেদ থাকাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। শূদ্রেরা নিকৃষ্ট কার্য্য, বৈশ্যেরা কৃষিকার্য্য এবং ব্যবসা, ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রালোচনা এবং ধর্ম্মচর্চ্চা করে। কিন্তু ইহারা আপনাপন কার্য্য করিতে থাকিলে দেশকে শত্রুর হস্ত হইতে কে রক্ষা করিবে! সুতরাং ক্ষত্রিয়জাতির প্রয়োজন হইল, এবং যখন ক্ষত্রিয়দিগের ধ্বংশ হইল তখনও কোন প্রকারের ক্ষত্রিয়জাতির আবশ্যক রহিল। বুদ্ধের পর শাক্যেরা সেই ক্ষত্রিয়জাতির পদ অধিকার করিয়াছিল, এবং শাক্যেরা পরাস্ত হইলে তাহাদিগের স্থানে রাজপুতেরা আসিয়া বসিল। পূর্ব্বকার ক্ষত্রিয়জাতি যে আর ভারতে নাই তাহার অতি অল্পমাত্র সন্দেহ আছে।

শাক্যেরা অনেককাল ধরিয়া কপিলবস্তুতে রাজত্ব করিয়াছিল। বৌদ্ধ লেখকদিগের বিবেচনায় দুইলক্ষ রাজা ক্রমান্বয়ে

সেই দেশের সিংহাসনে বসিয়াছিল। ইহা যে অত্যুক্তি তাহার আর সন্দেহ নাই। কালক্রমে অবশেষে জয়দেব নামে একজন রাজা হইলেন। জয়দেবের পুত্র সিংহহনু। তাঁহার গণ্ডদ্বয় সিংহের ন্যায় ছিল বলিয়া তাঁহার সিংহহনু নাম হইয়াছিল। এই রাজার চারিপুত্র এবং চারি কন্যা ছিল।* পুত্রদিগের নাম শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন এবং অমৃতোদন, এবং কন্যাদিগের নাম শুদ্ধা, শুক্লা, দ্রোণা এবং অমৃতা। তন্মধ্যে শুক্লোদনের দুইপুত্র আয়ুষ্মৎ জিন এবং শাক্যরাজ ভদ্র; দ্রোণোদনের দুইপুত্র মহানামন এবং আয়ুষ্মৎ অনিরুদ্ধ; অমৃতোদনের দুই পুত্র আনন্দ এবং দেবদত্ত। এতদ্ব্যতীত শুদ্ধার পুত্র সুপ্রবুদ্ধ, শুক্লার পুত্র মল্লিক, দ্রোণার পুত্র সুলভ এবং অমৃতার পুত্র কল্যাণবর্দ্ধন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে অম্ব রাজার চারি পুত্র এবং পাঁচ কন্যা কপিলবস্তু স্থাপন করিয়াছিলেন। কন্যাদিগের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠা তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হইয়া বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি তথায় একটি বৃক্ষতলায় লুক্কায়িত থাকিতেন। একদিন ব্যাঘ্রদর্শনে ভীতা হইয়া চীৎকাররবে সকলকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠিক সেইসময় কাশীর অধিপতি রাম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া সেই বনমধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি অম্বরাজার দুহিতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। অবশেষে উভয়ে কোন বৃক্ষমূল ভক্ষণ করিলে তাঁহাদিগের ব্যাধি দূর হইল। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কাশীতে প্রত্যাগমন করিলেন না। কোলি বলিয়া একটি নূতন নগর স্থাপন করিয়া তাঁহারা তথায় সুখে রাজত্ব করিতে লাগি-

---

* কেহ কেহ বলেন পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা ছিল।

লেন। ব্যাঘ্র দেখিয়া রাণী ভয় পাইয়াছিলেন বলিয়া এই নগরকে লোকে ব্যাঘ্রপুর বলিয়াও ডাকিত। কিছুদিন পরে কপিলবস্তুর রাজারা জানিতে পারিলেন যে কোলিনগরের রাণী তাঁহাদিগের ভগ্নী। শাক্যেরা অন্য গোত্রে বিবাহ করিলে পাছে তাহাদিগের কোন কলঙ্ক আসে এই আশঙ্কায় তাহারা আপনাদিগের বংশের ভিতর বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিল। এই সময় হইতে কপিলবস্তুর রাজবংশের কেবল ব্যাঘ্রপুরের রাজবংশের সহিত বিবাহ চলিতে লাগিল। তাহারা অন্য কোন বংশে পাত্র কিম্বা পাত্রী সমর্পণ করিত না।

ব্যাঘ্রপুর এখনকার কুয়ানা নদীর তটে স্থিত। কুয়ানা এবং রোহিণী একত্র হইয়া এখনকার ঘাবরা নদীতে মিলিত হইয়াছে। কপিলবস্তু হইতে ৫।৬ ক্রোশ পূর্ব্বে ব্যাঘ্রপুর। ব্যাঘ্রপুরে বরাহ অবতার হইয়াছিল বলিয়া এই নগর বরাহক্ষেত্র বলিয়াও বিখ্যাত আছে।

সিংহহনুর ভগ্নী ব্যাঘ্রপুরের রাজা অঞ্জশাক্যের সহিত বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র এবং দুই কন্যা হয়। পুত্রদ্বয়ের নাম সুপ্রবুদ্ধ এবং দণ্ডপাণি, দুই কন্যার নাম মহামায়া এবং মহাপ্রজাপতি। সিংহহনুর পুত্র শুদ্ধোদন ক্রমান্বয়ে এই দুই ভগ্নীকে বিবাহ করেন। মহাপ্রজাপতির গর্ভে নন্দ জন্মগ্রহণ করেন এবং মহামায়াদেবীর পুত্র প্রসিদ্ধ বুদ্ধদেব।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিদেশ সকলের অবস্থা।

বুদ্ধের জন্ম বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে তখনকার দেশবিদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা একবার আলোচনা করা উচিত।

কেননা মহাপুরুষেরা যখন তখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না। কোন বিশেষ অভাব হইলে কিম্বা পৃথিবী ঘোর পাপভারে আক্রান্ত হইলে সেই ভার মোচন করিবার জন্য তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য কোন ধর্ম্মসংস্থাপকের জীবন বর্ণনা করিতে গেলে তিনি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিলেন, দেশের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল এবং লোকদিগের আচার ব্যবহার বা কেমন ছিল, এ সকল বিষয় আমাদিগের জানা উচিত।

ভারতের কোন ইতিহাস নাই। সুতরাং এই সকল ব্যাপারের পরিষ্কার সমাচার কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মসাহিত্য সুপ্রচুর আছে। তাহা এক সমুদ্র সদৃশ। যতবার তাহাতে মগ্ন হই না কেন, কোন-না-কোন বহুমূল্য রত্ন পাইবই পাইব। এইরূপে পরিশ্রম করিয়া, বহু আয়াসে, বুদ্ধের সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ আহরণ করা যায়।

বুদ্ধের জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ অভ্রান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। এ বিষয়ে সিংহলে এক মত, তিব্বতে অন্যরূপ মত, নেপাল প্রভৃতি স্থানে আর এক মত এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত মত। তন্মধ্যে সিংহলদেশের মতটা অনেক পরিমাণে সত্য বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপীয়দিগের মতই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদিগের একটি দোষ আছে। এবং সেই দোষে তাঁহাদিগের সমুদয় গণনা দূষিত বলিয়া বোধ হয়। সে দোষটি এই যে তাঁহারা বিধিমতে ভারতের ঘটনাগুলিকে খ্রীঃ অব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কিম্বা যথেষ্ট পরে ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। যাহাতে এদেশের প্রাচীনত্বের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায় ইহাই

তাঁহাদিগের চেষ্টা; সেই জন্য তাঁহাদিগের গণনাগুলি আমাদিগের অবলম্বন করিতে হইলেও আমরা সে সমুদয়ে একেবারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চৌদ্দটি তারিখ বৌদ্ধ পুস্তক মধ্যে পাওয়া যায়। যথা, খ্রীঃ অব্দের ২৪২২, ২১৪৮, ২১৩৫, ২১৩৯, ১৩১০, ৭৫২, ৬৫৩, ৫৪৩, ৮৮০, ৮৩৭, ৫৭৬, ৮৮৪, ১০৬০, ৮৮২ বৎসর পূর্ব্বে। ইহাদিগের মধ্যে অতিশয় পূর্ব্বতম তারিখগুলি আমরা নির্ভয়ে অগ্রাহ্য করিতে পারি। খ্রীঃ অব্দের ছয় শত কিম্বা পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে তারিখ কয়েকটি দেওয়া হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে আপাততঃ কোন দোষ নাই। সিংহলদেশের গণনা অনুসারে বুদ্ধের নির্ব্বাণ খ্রীঃ পূর্ব্ব অব্দ ৫৪৩ বৎসরে হয়। বুদ্ধ ৮০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। সুতরাং এই মতে তিনি ৬২৩ পূর্ব্ব খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে সেই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনেক প্রকার স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল।

১। একেশ্বরবাদী ইহুদিরা নানা পাপে লিপ্ত হইয়া অবশেষে সকল বিষয়ে তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এতদবস্থায় ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাডনেজর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের দেবনগর জেরুসালেমকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহারা বন্দী হইয়া বিদেশে প্রাণত্যাগ করে। সেই পর্য্যন্ত ইহুদিরা আর স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। এক রাজার হস্ত হইতে আর এক রাজার হস্তে পড়িয়া পরাধীন অবস্থাতে দিনপাত করিতে হইয়াছে। পারসীক, গ্রীক এবং রোমকরাজারা আসিয়া ক্রমান্বয়ে তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে

বদ্ধ করে, এবং অবশেষে রোমকরাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতার জন্ত তাহাদিগকে দেশচ্যুত হইয়া ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িতে হয়। আজপর্য্যন্ত তাহাদিগের স্বদেশ বলিয়া একটি স্থান নাই। যে ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া ঈশার জন্ম এবং মৃত্যু হয় এবং যে যে কারণে ঈশার ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম হইতে পারিয়াছিল, সেই ঘটনা সকলের সূত্রপাত বুদ্ধের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কিম্বা পরে হইয়াছিল।

২। পারস্যদেশের ধর্ম্মসংস্কারক জোরোয়াস্তার এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবে ইরাণ আবার পুনর্জীবিত হয় এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম আমরা আজও বোম্বাই প্রদেশস্থ পারসীদিগের মধ্যে দেখিতে পাই।

৩। চীনদেশে মহাজ্ঞানী কনফুসিয়াস্ এই সময়ে লোকদিগকে নূতন ধর্ম্ম এবং নূতন শাসনপ্রণালী প্রদান করেন।

এই ঘটনাগুলি সামান্য ঘটনা নহে। আমরা দেখিতেছি যে খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দী পৃথিবীর পক্ষে এক প্রকার নবযুগ হইয়াছিল। কেবল ভারতে নহে, সকল দেশে নবজীবন আরম্ভ হইয়াছিল। মনুষ্যসমাজের নিয়মই এইরূপ। কখন্ নিদ্রাবস্থা, কখন জাগ্রত ভাব। ঘোর অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া যখন নূতন সত্যসূর্য্য প্রকাশিত হয় তখনই পৃথিবীতে নব তত্ত্ব, নব শাস্ত্র, নব বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, তখনই মানুষ মানুষকে ভ্রাতা বলিয়া চিনিতে পারে, তখনই পরমেশ্বরের মুখ মানুষ প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পায় এবং তখনই পৃথিবীর নূতন শ্রী হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্বদেশের অবস্থা।

বিদেশ হইতে স্বদেশে আসিয়া দেখি যে এখানেও নবজীবনের আয়োজন সমুদয় প্রস্তুত। সে সময়কার ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে তখন বৈদিক ধর্ম্মের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব ছিল। পৌরাণিক ধর্ম্ম আসিতে আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু পুরাণের দেবদেবীদিগের তখনও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। লোকেরা ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিবের পূজা করিত। কিন্তু দুর্গা, কালী, কার্ত্তিক, গণেশ, স্বরস্বতী এবং লক্ষ্মী তখনও লোকের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কৃষ্ণপূজার আরম্ভ হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না ; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে কৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি-পূজার তখন সৃষ্টি হয় নাই।

তেত্রিশ কোটি দেবতা তখনও ভারতের গগনে উদয় হয় নাই। বৈদিক ধর্ম্ম, বৈদিক আচারব্যবহার তখন পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঋষিমুনিরা বনের মধ্যে, পর্ব্বতের মধ্যে তপস্যা করিতেন। তন্মধ্যে এক একজন অসাধারণ ধীসম্পন্ন যোগী অগণ্য শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া দেশেদেশে ভ্রমণ করিতেন। সাধনের কঠোর নিয়ম সকলই বর্ত্তমান ছিল। যাগ, যজ্ঞ, নিত্যনৈমিত্তিক বেদের মতে সম্পাদিত হইত। তবে পূর্ব্বের মত রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রচলিত ছিল না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, তখন এমন কোন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন না যিনি অন্য রাজাদিগকে অধীনস্থ করিতে সাহস করিতেন। তখনকার ধর্ম্ম কার্য্যকলাপেই বদ্ধ ছিল। নীতিসঙ্গত যুক্তিসঙ্গত ধর্ম্ম তখন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। পূজা করিলে, মন্ত্র পাঠ

করিলে, অনাহারে যাগযজ্ঞ করিলে মুক্তি হয় এই বিশ্বাস সকলকার ছিল। কিন্তু মন ভাল করা উচিত, পাপ থাকিলে মুক্তি হয় না, পুণ্যই স্বর্গের সোপান এ প্রকার মত তখন প্রচার হয় নাই।

ভারতে মূর্ত্তিপূজা কখন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তবে বুদ্ধের সময় দেবদেবীগণের প্রতিমূর্ত্তি-পূজা হইত ইহার প্রমাণ যথেষ্ট পাই। এদেশে বিশুদ্ধ একেশ্বরতত্ব (Theism.) কখন প্রচলিত ছিল কিনা বলিতে পারি না। তবে পূর্ণব্রহ্ম লইয়া অনেক চর্চ্চা হইত এবং পণ্ডিতেরা ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মসাধন লইয়া অনেক বিচার করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত মূর্খদিগের অনেক কাল হইতে বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মতত্ব পণ্ডিতদিগের জন্য ছিল এবং দেশীয় ধর্ম্ম, লৌকিক আচার সকল সামান্য লোকদিগের জন্য হইল। প্রতিমূর্ত্তিপূজার সৃষ্টি এই কারণেই হয়। শাক্যমুনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তৈত্তিরীয় ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উপনিষদের পর বৌদ্ধধর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায়। একদিকে যেমন উপনিষদ সকল ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া নিযুক্ত ছিল, আর এক দিকে দর্শনশাস্ত্র সকল জগতের উৎপত্তি, আত্মার স্বরূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ, জড়বাদ ও প্রকৃতিপুরুষতত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিল। বুদ্ধের পূর্ব্বেই যোগ, মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায় এবং সাংখ্য দর্শন সকল রচিত হইয়াছিল। সুতরাং যখন বুদ্ধ জন্মগ্রহন করেন তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুদয় প্রশ্নই এক প্রকার উত্থাপিত হইয়াছিল। দর্শনসম্বন্ধে বিবিধ দুরূহ প্রশ্ন সেই সময়েই উত্থাপিত হয় এবং তাহাদিগের মীমাংসা সেই সময়েই হয়।

তাহার পর আজপর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে একটি নূতন কথা কেহ বলিতে পারেন নাই এবং দার্শনিক উন্নতি এক পদ মাত্র অগ্রসর হয় নাই। সেই তখন যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার পর টীকা, ব্যাখ্যা, ভাষ্য প্রভৃতি ব্যতীত আর অন্য কোন কথা নাই। গ্রীসদেশে আরিষ্টটল্ এবং প্লেটো দর্শনসম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার পর যেমন আজ পর্য্যন্ত ইউরোপে কেহ একটি নূতন কথা বলিতে পারেন নাই, ভারতে কপিল, গৌতম, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতি দার্শনিকেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার উপর একটি নূতন কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারেন নাই। বুদ্ধও তাঁহার ধর্ম্ম দর্শন সম্বন্ধে একটি নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে পারেন নাই। পুনর্জ্জন্ম এবং কর্ম্মফলতত্ত্ব এ দুইটি ভারতের নূতন কথা। এ দুইটি কথাই বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। কর্ম্মফলনিয়ম সত্য বলিয়াই তিনি দেবদেবী, জাতিভেদ, স্বর্গ নরক প্রভৃতি ব্যাপার মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের এ সকল কথা কিছুই নূতন নহে। ইহাতে নূতন কি ছিল তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। তবে এখন এইমাত্র বক্তব্য যে বুদ্ধকে দর্শনসম্বন্ধে নূতন মত কিছুই সৃষ্টি করিতে হয় নাই। তাঁহার পূর্ব্বে বিশ্বের মূলতত্ত্বগুলি দর্শনসমূহে আলোচিত হইয়া গিয়াছিল। উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছিল। প্রতিমূর্ত্তি-পূজা সম্পূর্ণরূপ বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে মহাভারতও রচিত হইয়া গিয়াছে, যেহেতু মহাভারতের দু' একটি শ্লোক আমরা ললিতবিস্তরে উদ্ধৃত দেখিতে পাই।

বুদ্ধের সময় ভারতে কোন বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিল না। সমস্ত দেশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। একটি নগর—কতিপয় গ্রাম লইয়া একজন রাজার রাজত্ব ছিল। যুধিষ্ঠিরের পর আর

কোন নৃপতি ভারতবর্ষকে একছত্রের অধীন করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় আর্য্যভারতই বিদ্যমান ছিল। তখন পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, কোশল এবং বিদেহ রাজ বর্ত্তমান ছিল এবং এতদ্ব্যতীত বৈশালি মথুরা এবং মিথিলা দেশে বহু পুরাতন রাজবংশ সকল জীবিত ছিল। ক্ষত্রিয়দিগের তখন পর্য্যন্ত পূর্ণ আবির্ভাব ছিল। পুরাতন আর্য্যদেশ, অর্থাৎ রামায়ণ এবং মহাভারতের আর্য্যদেশ তখন সশরীরে বর্ত্তমান। বুদ্ধের পর নূতন সময় আসিয়া পুরাতনকে বিনাশ করিল। কিন্তু তাঁহার জন্মকালে এদেশের লোকেরা সেই পুরাতন বায়ু সেবন করিতেছিল। সেই ধুপধূনার গন্ধ, সেই মন্ত্রপাঠের আড়ম্বর সেই পর্ব্ব সকলের প্রাদুর্ভাব বুদ্ধ আসিয়া সমস্তই দেখিলেন। তাঁহার সময়ে দেশের অবস্থা এইরূপ ছিল। কিন্তু তাঁহার পরে একেবারে কি পরিবর্ত্তন হইল!

আর সে পাণ্ডবেরা রহিল না। পুরাতন রাজবংশ সকল লুপ্ত হইয়া গেল। ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইলে শূদ্রেরা রাজত্ব করিতে লাগিল। মদ্যপানপ্রথা পূর্ব্বে অতিশয় প্রচলিত ছিল, এখন তাহা বন্ধ হইল এবং জীবহত্যা গিয়া নিরামিষ ভোজন দেশের নূতন আচার হইল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা হীনপ্রভ হইলে বৌদ্ধ শ্রমণ এবং অর্হতেরা আসিয়া তাহাদের স্থান গ্রহণ করিল। সন্ন্যাসীদিগের আর তেমন আদর রহিল না, তাহাদিগের স্থান ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা অধিকার করিল। আর পুরাতন প্রথা মতে কেহ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাহিত না—এখন নূতন ভাবে স্তূপ ও বিহার সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। দেবদেবীদিগের প্রতিমূর্ত্তির আর সে আদর রহিল না, তাহাদিগের পরিবর্ত্তে বুদ্ধের

প্রতিমূর্ত্তি চারিদিকে বিরাজ করিতে লাগিল। নূতন প্রকারে গৃহনির্ম্মাণ প্রথা প্রচলিত হইল এবং নূতন ভাস্করবিদ্যা আবিষ্কৃত হইয়া দেশকে নূতন শ্রী ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিল। জাতি-ভেদ প্রথা কিছু কালের জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আর্য্যধর্ম্ম যেমন দেশীয় ধর্ম্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম্ম তেমনি মানবধর্ম্ম হইল। এদেশে কোন কালে ধর্ম্মপ্রচার প্রথা ছিল না—কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার-কেরা দেশ বিদেশে গিয়া তাহার মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহারা বেদ উচ্চারণ না করিয়া বৌদ্ধসূত্র এবং বিনয় উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পুরাতন পর্ব্ব গিয়া বুদ্ধের রথযাত্রার সৃষ্টি হইল। এই রথযাত্রা এখন জগন্নাথ দেবেরই আছে। কিন্তু ইহার আরম্ভ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে হয়।

যখন মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহারা পৃথিবীকে একভাবে দেখেন, তাহার পর ইহলোক হইতে বিদায় লইবার সময় তাঁহারা সেই পৃথিবীকে নূতন বেশে সজ্জিত দেখিয়া যান। বুদ্ধদেবের জন্ম হইবার সময়ে ভারতের অবস্থা কি ছিল তাহা বর্ণিত হইল। তাঁহার জীবিতাবস্থায় এমন কি শক্তি আসিল যাহার প্রভাবে ভারতকে আবার নূতন আকার ধরিতে হইল, এই প্রশ্নের উত্তর দানে আমরা এখন নিযুক্ত হইলাম।

৫২৭

শিশুর আদর।

কে চায় নলিন্ সূর্য্যমুখী?
কে চায় কুমুদ হাস্যমুখী?
বাসর ঘরের কনের মত
বরণ কালের বধূর মত!

কে চায় অশোক, আগাগোড়া,
রাঙা জামাজোমায় মোড়া?
লাল পাগ্‌ড়ি, লাল চোগা,
পুলিস চৌকির দারোগা!

কে চায় কদম? যায় উড়ে
আঙরাখাটি ফুর্‌ফুরে!
অঙ্গ ভেজে, হায় তবু
মহা সৌখীন্ ফুল বাবু!

(আমি) চাই মালতি, বকুল জাতি;
চাই অতসি, রূপের ভাতি!
খোকার মত!
খুকির মত!

(আমি) চাই সিউলি, টুক্‌টুকে;
সেঁউতি, জুঁই, ফুট্‌ফুটে;
বাছুর মত!
ধোনার মত!

পূজার ছুটি।

গাড়ী ষ্টেশনের পর ষ্টেশনে থামিতে থামিতে আমার গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। আমি নামিয়া পড়িলাম।

রাত্রি তখন আটটা। ষ্টেশনের বাহিরে আমাদের গ্রামস্থ তিনটী স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইল; একজন কিশোরবয়স্ক অপর দুইটী বালক। তাঁহারা তিন জনেই এক পরিবারভুক্ত। কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করেন, সম্প্রতি ছুটিতে বাড়ী যাইতেছেন।

আমরা চারিজনে একখানি গাড়ী ভাড়া করিব স্থির হইল। বহুত গ্রাহক, এদিকে গাড়ী কম, গাড়োয়ানদের সুতরাং পোহা-বারো। অন্য সময় তাহারা ছুটিয়া আসিয়া হাতের ব্যাগ বহিয়া গাড়ীতে লইয়া যায়, আজ আর তাহাদের মাটিতে পা পড়ে না; তারা কোচবাক্সে গম্ভীরভাবে অমনি বসিয়া রহিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই, আমরা নিজের দায়ে অগত্যা মহম্মদের সেই উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিলাম। গাড়োয়ানেরা অগ্রসর হয় না দেখিয়া, আমরাই শেষ গাড়ীর কাছে হাজির হইলাম। অন্য সময় দুই টাকার মধ্যেই গাড়ী মিলে কিন্তু আজ আর কেহ পাঁচ টাকার কমে যাইতে স্বীকার হইল না। আমরা তাই স্বীকার করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম,গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল—পক্ষীরাজ-দ্বয় গজেন্দ্রগতিতে ছুটিলেন। তাহাদের প্রতি পদক্ষেপে একটা গভীর ঔদাস্য ও নির্লিপ্ততার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। হায়, আগে বুঝি নাই এই অশ্বিনীকুমারযুগলেরও গাড়োয়ানদের মত পায়াভারি হইয়াছে। গাড়োয়ানের পায়াভারি গ্রাহক দেখিয়া, আর ইহাদের ক্ষেপ বহিয়া বহিয়া।

যাইহোক কোনরূপে আমরা রাত্রি এগারটার সময় যথাস্থানে

পৌঁছিলাম। এইবার নৌকায় যাইতে হইবে। এখান হইতে আমাদের বাড়ী সাত ক্রোশ, তবে জলপথে কিছু ঘুরিয়া যাইতে হয়।

সে দিন চতুর্দ্দশী। জ্যোৎস্না অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে; রাত্রি কিছু অন্ধকার তবে ঘোর নহে। সেই তরল অন্ধকার ভেদ করিয়া তারকারাজি অল্প অল্প কিরণ দিতেছিল। আমরা তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। অনুকূল বাতাস বহিতেছিল, মাঝিরা পাল তুলিয়া দিল। সেই নিশীথরাত্রে, অনন্ত আকাশতলে প্রশান্ত ভাগীরথীবক্ষে পালভরা নৌকা তরতর বেগে মুক্ত-পক্ষ কলহংসীর মত হেলিতে দুলিতে চলিল। আশ্বিনে বর্ষার সে দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য নাই, কিন্তু ভাগীরথী এখনও কূলে কূলে পূর্ণ। যৌবনের সে মত্ততা গিয়াছে কিন্তু যৌবন আজিও চলচল। গঙ্গার উভয় কূলের দূরস্থ গ্রামগুলি কুয়াশাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। গাছপালা সবই ছায়া-ছায়া যেন চিত্রার্পিত। কোথাও বা অদূরে দুই একটা সৌধ শ্রেণী পড়িয়া আছে; কোনটীর বা মুক্ত বাতায়নপথে আলো দেখা যাইতেছে। দূরে মাঝিমাল্লারা সারি গাহিয়া চলিয়াছে, গান বুঝা যায় না, কিন্তু সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে সঙ্গীতের সেই শেষ ভাগ বড়ই মধুর শুনাইতেছিল। আর আমার মনে যে সঙ্গীত বাজিতেছিল, তা আরও মধুর।—ক্রমে আমারও তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা স্বপ্নময়, আর স্বপ্ন যে কি-ময় এবং কে-ময় তাহা বলিতে হইবে কি?

কখন প্রভাত হইয়াছিল জানি না। বেলা তিন চারি দণ্ডের সময় মাঝিদের ডাকে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মাঝিরা বলিতেছে—"বাবু ঘাটে এসেছি উঠুন।" কথাটা—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। সঙ্গে যে বালক দুইটী ছিল, তাহারা নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্রই লাফ দিয়া ঘাটে উঠিয়াছিল—আমরা তীরে উঠিতে না উঠিতে তারা কতদূর চলিয়া গেল।

গঙ্গার ধার হইতে আমাদের বাড়ী একপোয়া পথ। গ্রামের নীচেই বিল, কিছু ঘুরিয়া সেই বিল-পথে গেলে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। আমরা ততটা ঘুরিতে প্রস্তুত ছিলাম না।

বালক দুইটী চলিয়া গেলে আমি সেই কিশোরটীকে বলিলাম, "কই উপেন, তুমি যে ওদের সঙ্গে গেলেনা?", সে কোন উত্তর দিল না, কেবল আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। সে হাসি ঔদাস্যের। আমি সে ঔদাস্যের কারণ বুঝিলাম। তাহার মত বয়সে আমারও একদিন এইরূপ উদাস ভাব আসিয়াছিল। বাল্যকালে পূজা বলিয়া গৃহ বলিয়া যে একটা দুর্দ্দমনীয় টান থাকে আমোদে যত উৎসাহ থাকে, বয়সে ক্রমে তাহা কমিয়া আসে। কমিতে কমিতে এই কিশোর অবস্থায় যেন একান্তই কমিয়া যায়; তখন কেমন একটা উদাস ভাবে হৃদয় ছাইয়া ফেলে—বাল্যকালের সে সকল আমোদে মন আর মাতে না, সে সব বাঁধনে তেমন টান থাকে না। যেন কি একটা অভাবে কি একটা শূন্যতায় হৃদয় সর্ব্বদা খাঁ খাঁ করিয়া বেড়ায়, পুরাতনের কিছুই আর তাহা পূর্ণ করিতে পারে না। শেষ আর এক নূতন বন্ধন হয়, সে বন্ধনে শিথিল গ্রন্থি সব আবার দৃঢ় হইয়া পড়ে, জগৎ আবার স্নেহময় হইয়া উঠে—শীতের পর বসন্তের উদয় হয়।

উপেনের বয়স সতের আঠার বৎসরের মধ্যে। বলা বাহুল্য সে অবিবাহিত।

জিনিসপত্র বাঁধিয়া মাঝির মাথায় দিয়া আমরা দু'জনে নৌকা

হইতে উঠিলাম। তীর হইতে গ্রাম নজরে পড়িতেছিল। কিছুদূর গিয়াই সম্মুখে দেখিলাম প্রকাণ্ড শস্যক্ষেত্র। সেখান হইতে সেই সুদূরবিস্তৃত, বায়ুহিল্লোলবিধূত শ্যামল শস্যরাজি দেখিয়া মন মুগ্ধ হইল। আমরা সেই শস্যক্ষেত্রের মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথ ধরিয়া চলিলাম।

গ্রামে প্রবেশ করিলাম। বর্ষার অবসানে অশথ, বট, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ সকল কেমন সতেজ, তাহাদের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় চিক্কণ যৌবন উদ্ভাসিত। মাঝেমাঝে স্তবকে স্তবকে "রাধাচূড়া" পুষ্পের লোহিত আভা শ্যামল পত্রের অবকাশপথে পড়িয়া মন হরণ করিতেছিল। পুষ্করিণীগুলি কাণায় কাণায় পূর্ণ। কোনটীর বা উভয়পার্শ্বে কদলীবৃক্ষের শ্রেণী বিরাজ করিতেছে, কোথাও বা নানাবর্ণের করবী, দোপাটী এবং শেফালিকা ফুটিয়া দিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

বাটীতে প্রবেশ করিয়াই পিতৃদেবের দর্শন মিলিল, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট বসিলাম—তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার পর বাটীর ভিতর গেলাম। একে একে মা, ভগ্নী, পিসিমা, ঠাকুরমাতা প্রভৃতি সকলে আমায় ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। গুরুজনদের যথারীতি প্রণাম করিলে পর, ভগ্নী একটা মাদুর বিছাইয়া দিলেন—আমি সেখানে বসিলাম। বালকবালিকার দল ছুটিয়া আসিল; কেহ কোলে, কেহ পাশে বসিল। মা খাবার আনিতে গেলেন, আর সকলে কাছে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। অনেকদিনের পর, স্নেহের পুত্তলি ও ভক্তির প্রতিমাগুলি দেখিয়া হৃদয় আনন্দে উছলিয়া উঠিল। কিন্তু সত্য কথা লুকাইব না—কথা কহিতে কহিতে মাঝেমাঝে অন্যমনস্কও হইতেছিলাম। আমার চঞ্চল চক্ষু কোন একটি নেপথ্যবর্ত্তিনীর উদ্দেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। আর ও একটি উৎসুক দৃষ্টি যে অদূরে

অন্তরালের ছিদ্রপথে ঘনপক্ষ্মচ্ছায়াতলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা আমার অন্তর জানিত

জল খাওয়ার পর বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইলাম। পূজায় অনেকেই বাটী আসিয়াছেন, একে একে প্রায় উপস্থিত সকলের সঙ্গেই দেখা করিলাম।

বাল্যকালের সেই বাঁধাঘাট, সেই বটগাছ সেই বকুলতলা সকলই দেখিলাম। শৈশবের কত কথা মনে পড়িল—হায়, আজ সে সব দিন কোথায়! আর সেই শৈশবের সেই যে সঙ্গী, তারাই বা আজ কোথায়! কেহ দেশান্তরে, বহুকাল দেখি নাই—কেহ লোকান্তরে, এ জীবনে দেখিবার আশা নাই।

দেখাসাক্ষাতে, আহারে, নিদ্রায়, গল্প গানে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল—রাত্রি নয়টার পর আহারাদি করিয়া শয়ন-গৃহে গেলাম। আজ এ পর্য্যন্ত আমার সেই নয়নানন্দদায়িনীর সাক্ষাৎ পাই নাই। বালিকা বা যুবতী বধূর শ্বশুর-গৃহে দিবসে স্বামী-সন্দর্শন বড় কঠিন কথা। গৃহে আসিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা শুইয়া রহিলাম। পাতাটী নড়িলে, বায়ু একটু সশব্দে বহিলে উৎফুল্ল হইয়া উঠি, কিন্তু বৃথা আশা। মনে হইতে লাগিল—

"জানে কাঁদি তার তরে,
তবু সে বিলম্ব করে
রমণী নিদয়!"

কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া তাঁর আসিতে এ বিলম্বটুকু হইতেছে তাহা বুঝিয়াও অবুঝ মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ পিছন হইতে কে আমার চক্ষু টিপিয়া ধরিল। কি কোমল স্পর্শ!

আমাদের বাটীতে পূজা হয়। আমরা সকল জাতি মিলিয়া

একত্রে পূজা করিয়া থাকি। সুতরাং কাহারো ব্যয়বাহুল্য হয় না। বিশেষ এই পূজার জন্য পৃথক জমীর বন্দোবস্ত আছে।

আজ সপ্তমী পূজা। পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। দলেদলে বালকবালিকা "আঙ্গা কাপড়" পরিয়া পূজা দেখিতে ছুটিয়াছে।

সন্ধ্যার পর আরতি। পুরোহিত ঠাকুর যথা সময়ে পঞ্চ প্রদীপ হস্তে আরতি আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হস্তের সেই কৌশলময় সঞ্চালন দেখিবার জিনিস বটে। প্রতিমার নিকটে ঘনঘন ধূপধুনা জ্বালান হইতেছিল—উভয় পার্শ্বে সারি বাঁধিয়া চামর-ব্যজন চলিতেছিল, মাঝে মাঝে লাল নীল আলোয় চণ্ডীমণ্ডপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। কাঁশরঘণ্টার রবে দিক পূরিয়া উঠিয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল শানাই বাজিতেছিল। অসংখ্য নরনারী ভক্তিভরে, একদৃষ্টে প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে সময়ে এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে কেমন একটা পবিত্র ভাব আসিল, ভক্তিভরে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল।

পরদিন অষ্টমী পূজা। অন্যবার সন্ধিপূজা গভীর রাত্রে হইয়া থাকে, এবার আরতির সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধিপূজার আরম্ভ হইল। আজ পূজার জম-জমাটা আরও কিছু বেশী রকমের।

নবমীর দিন লোকজন খাওয়াইতেই কাটিয়া গেল। তারপর বিজয়া দশমী; বৈকালে প্রতিমা বরণ হইল। আজ গ্রাম ও আশপাশ হইতে অনেক লোক বিসর্জ্জন দেখিতে আসিয়াছে।

আমাদের গ্রামে আরও দুইখানি পূজা হইত। তিনখানি প্রতিমা একত্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া একসঙ্গে বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম। [illegible]র প্রান্তেই বিল। সেই বিলে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। [illegible]বিল এখনও জলে পূর্ণ, সুতরাং প্রতিমা লইয়া "বাচখেলার" বড় সুবিধা। আমরাও নৌকাবিহারের লোভ সম্ব-

রণ করিতে পারিলাম না। প্রকাণ্ড বিল, বিলের একধার হইতে অন্য ধার স্পষ্ট নজর হয় না। চারিদিকে কেবল স্থির জলরাশি, মাঝে মাঝে নিমোজ্জনোন্মুখ গুল্মবৃক্ষাদির শাখা জাগিয়াছে মাত্র। সেই সব শাখায় শাখায় শ্যামল পত্রের অন্তরালে বক সারসাদি বসিয়া আছে। কোথাও বা কলহংসী, কারণ্ডব, চক্রবাকমিথুন প্রভৃতি জলচর পক্ষী সন্তরণ করিতেছিল—সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে কুলায় উদ্দেশে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর বিসর্জ্জন দিয়া—আমরা নৌকা ফিরাইলাম। কূলে পৌছিবার পূর্ব্বেই জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। কৌমুদী-কিরণ-সম্পাতি জলরাশির শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা উপরে উঠিলাম। তখন শানায়ে পূরবী রাগিণীতে বিসর্জ্জনের গান গাহিতেছিল—সেই গানের সঙ্গে তখনকার প্রাণের সুর মিলিল।

গৃহে ফিরিতে একটু রাত্রি হইল। তার পর সকল পরিবার একত্র হইয়া সম্বন্ধ অনুসারে প্রণাম, আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ চলিতে লাগিল। শেষ, গ্রামস্থ স্বজাতি, কুটম্ব আত্মীয় সকলের বাটীতে বিজয়ার প্রণাম উদ্দেশে বাহির হইলাম। আজ আর শত্রু মিত্র ভেদ নাই, শত্রু শত্রুতা ভুলিয়া মহাশত্রুকে আলিঙ্গন করিতেছে, আজ সকলের মন যেন শান্তি ও ক্ষমায় পূর্ণ।

আহারাদির পর শয়ন-গৃহে বসিয়া আছি, সহসা গৃহিণী আসিয়া ঢিপ করিয়া একটী প্রণাম করিলেন। নূতন নিয়মে, গৃহিণীকুলের নিকট আর বড় একটা প্রণাম পাওয়া যায় না, তাই প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে প্রতিদানে আমিও আমার কর্ত্তব্য সাধন করিলাম।

আজ পূর্ণিমা। রাত্রে ওপাড়ায় রায়েদের বাটীতে যাত্রা হইবে। স্বভাবতই আমি এখন একটা রাত্রিও নষ্ট করিতে প্রস্তত

মই। কিন্তু কি করি, বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে ও বিদ্রূপে পড়িয়া যাত্রা শুনিতে যাইতে হইল। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষ পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলাম। শয়ন-গৃহের দ্বারে আসিয়া শিকল নাড়িলাম; দরজা খুলিয়া ঠাকুরমাতা বাহির হইলেন। একটু রহস্য করিতেও ছাড়িলেন না। ঘরে গিয়া দেখি গৃহিণী নিদ্রাভিভূতা। বুঝিলাম, কয়েক দিন উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগিয়া আজ এই অবকাশে একটু ঘুমাইয়া লইতেছেন। এতক্ষণ ঠাকুর মা তাঁর কাছে ছিলেন, শিকল নাড়ার শব্দ শুনিয়াই তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল; তিনি আর ইহাঁর ঘুম না ভাঙ্গাইয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিলেন।

মুক্ত বাতায়ন-পথে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ আসিয়া শয্যায় পড়িয়াছিল। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই শরৎজ্যোৎস্নার সহিত আমাদের গৃহ-জ্যোৎস্নার মিলন দেখিতেছিলাম।

ছুটির দিন ফুরাইল। আজ রাত্রি দশটার পর আমাকে কলিকাতা রওনা হইতে হইবে।

সমস্ত দিন কোথাও বড় একটা বাহির হইলাম না—মা, পিসিমা, ভগ্নী ইহাদের কাছে কাছেই রহিলাম। সন্ধ্যার পরই আহার করিয়া শয়ন করিতে গেলাম।

আমি যাওয়ার একটু পরেই গৃহিণী উপস্থিত হইলেন। সেই স্বভাবপ্রফুল্ল মুখখানি বড় বিষণ্ণ।

অন্য দিনের অপেক্ষা দশটা আজ যেন দু'চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে বাজিল। বিদায়কালীন মিলন যখন নিবিড়তম তখন কে ডাকিল, "বাবু মাঝি এসেছে।"

একে একে সকলের কাছে বিদায় লইলাম। নৌকায় উঠিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নিছনি।

৪র্থ এবং ৫ম সংখ্যা সাধনা পাঠে "নিছনি" শব্দের নানা অর্থ দেখিতে পাইলাম। আমাদের এতদ্দেশে প্রাচীন কাল হইতে যেরূপ অর্থে "নিছনি"র ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, নিম্নে লিখিতেছি।

"নিছনি" বস্তুবাচক নাম। স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা প্রভৃতি, এমন কি মরকতাদি মণিও "নিছনি" রূপে ব্যবহার করা প্রচলিত আছে। পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কাহারও মঙ্গলোদ্দেশে অথবা অমঙ্গল ও অগু দূরীকরণার্থে মহিলাগণ নিজ নিজ অবস্থানুসারে পূর্ব্বোক্তপ্রকার মুদ্রা বা মণিরূপ নিছনি দ্বারা নিছাইয়া থাকেন। পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি নমস্য ব্যক্তির দক্ষিণ উরুতে, স্বামীর বাম উরুতে ও পুত্র, কনিষ্ঠভ্রাতা এবং দেবর প্রভৃতি আশীর্ব্বাদপাত্রদের ললাটদেশে উক্তপ্রকার মুদ্রা বা মণি স্পর্শ করাইয়া, তাহা আশ্রিত গ্রহাচার্য্যকে দেওয়ার রীতি আছে। এই নিয়ম বোধ হয়, স্ত্রীলোক দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। পুরুষদের এরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায় না।

আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী ঐ ভাবেই অর্থ করিয়া থাকি। কোনরূপ গোলযোগ হয় না। যথা :—

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনো
মূলে বিকালাও, আর কি দিব নিছনি।

ইহার অর্থ—তোমার প্রেমে যখন আমি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি, তখন "নিছনি" দিবার আর কিছু অবশিষ্ট নাই, অর্থাৎ তোমার অমঙ্গল দূরীকরণ বস্তুও অবশিষ্ট রাখি নাই।

নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন,
নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ।

অর্থ এই—আমার বংশমর্য্যাদা অকলঙ্ক বলিয়া জগতে বিখ্যাত; তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া তাহাও "নিছনি" রূপে দিলাম, অর্থাৎ তোমার জন্য আমি সকলই দিতে পারি।

জনৈক পাঠক।
ত্রিপুরা।

প্রথম ভাগ চতুর্থ সংখ্যা সাধনায় প্রকাশিত প্রশ্ন।

বাল্মীকির রামায়ণের টীকাকার রামানুজ ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক রামানুজ এক ব্যক্তি কি না? "প্রপন্নামৃত" নামক গ্রন্থানুসারে রামানুজ ৯৩৯ শকাব্দে প্রাদুর্ভুত হন। এবং স্মৃতিকালতরঙ্গ মতে রামনুজের আবির্ভাবকাল ১০৫৯ শকাব্দ। উক্ত রামানুজদ্বয় যদি এক ব্যক্তি না হন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কোন্ রামানুজ রামায়ণের টীকাকার ও তিনি কোন সময়ের লোক? পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

উত্তর।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদিত রামায়ণ পুস্তকে "রামানুজ কৃত টীকা সমেতম্" এই কথা লেখা থাকায় অনেকেই মনে করেন, বেদান্ত ভাষ্যকার ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য রামানুজস্বামী রামায়ণ মহাকাব্যেরও টীকাকার। কিন্তু এই বিষয়ে অনেককে সন্দিহান হইতেও দেখা যায়। আমরাও সন্দেহকারী দলের অন্যতম। রামায়ণটীকাকার আপনাকে যেরূপে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনি যে রামানুজ নহেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। তিনি বরাবর সর্গসমাপ্তির শেষে "শ্রীরামীয়ে রামায়ণ-তিলকে" এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ বাক্যের অর্থ "শ্রীরামেণ প্রোক্তং শ্রীরামীয়ং তস্মিন্" এইরূপ। উহার ভাবা কথা এই যে, টীকার নাম রামায়ণ-তিলক এবং টীকাকারের নাম শ্রীরাম। শ্রীরাম কি রামানুজ? রামানুজ কেন স্বীয় নামের অর্দ্ধাংশ মাত্র লিখিবেন? প্রারম্ভেও দেখা যায়—

> "—রামো রাম প্রবর্ত্তকঃ।
> রামায়ণস্য তিলকং কুরুতে রামতুষ্টয়ে॥" *

এই মাত্র কথা আছে। ইহাতেও রাম ব্যতীত রামানুজ শব্দ নাই। আমরা রামানুজের শ্রীভাষ্য ও প্রপন্নামৃত এই দুই গ্রন্থ দেখিয়াছি। তাহাতে তিনি

---

* "রাম প্রবৃত্তিকঃ" পাঠ সঙ্গত। অর্থ রামপরায়ণ ইঃ উঃ।

নিজ নাম রামানুজ যে রাম কি শ্রীরাম বলিয়া ব্যবহার করেন নাই। তবে কেন রামায়ণ-টীকা রামানুজের কি না, এ আশঙ্কা জন্মে?

রামায়ণ-টীকাকার শ্রীরাম উত্তরকাণ্ডের টীকায় রামের ব্রহ্মলোক গমন, শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ গ্রহণ, এই সকল কথা বলিয়াছেন, বৈকুণ্ঠগমনের কথা বলেন নাই। তাহা না বলাতে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এ রাম বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য রামানুজ নহে। উত্তরকাণ্ডের শেষ সর্গের ১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা শাঙ্কর বেদান্তেরই অনুরূপ। পাঠ করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে, তিলককার শ্রীরাম শাঙ্কর বেদান্তের অনুকারী কি না। বাসিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকার আনন্দবোধ ১৭৬৬ সম্বৎ অব্দে বাসিষ্ঠ রামায়ণের টীকা লেখেন। তিনি বলিয়াছেন—"ব্যাখ্যাবাণী ... ... শ্রীমৎ রামমুনীং"—পরমগুরু শ্রীরাম মুনির চরণে নমস্কার করি। আমরা শুনিয়াছি এবং পুস্তকের গায়েও টিপ্পন আছে, ব্যাখ্যা রামায়ণ-ব্যাখ্যা। এতদনুসারে স্থির হইতেছে, আনন্দবোধের পরমগুরু শ্রীরাম কর্ত্তৃকই রামায়ণতিলক নির্ম্মিত হইয়াছে, অনেক পুরাতন রামানুজ কর্ত্তৃক হয় নাই। রামানুজাচার্য্য কুমারপালের কিছু অল্পকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন, সে জন্য সম্ভবতঃ তিনি এক্ষণে অন্যূন ৬০৫ বৎসরের প্রাচীন।

তিলককার শ্রীরাম যে কতক ও তীর্থ এই দুই প্রাচীন টীকার সর্ব্বদাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বয়ের অন্যতম অর্থাৎ তীর্থ উপরোক্ত সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এ সংবাদও রামায়ণতিলককার শ্রীরামের রামানুজ অপেক্ষা আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

গ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব দুঃখ নিষ্কৃতি পাইতে হইলে বাসনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মবন্ধন করিয়া নির্ব্বাণলাভের চেষ্টা করিতে হয়। নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হলে আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না। সেই দুঃখ হইতে রিত্রাণই বৌদ্ধধর্ম্মের চরম লক্ষ্য।

এই দুঃখ হইতে ত্রাণলাভের জন্য কেন যে, সমস্ত কর্ম ও বাসনা দূর করা কর্ত্তব্য তাহা একরূপ বুঝা যায় কিন্তু কেন যে, সৎকর্ম্ম করিব, পরোপকার করিব এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। কেবল বলা হইয়াছে বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় নহে সক্রিয় ধর্ম্ম।

ভাল মন্দ সকল প্রকার কর্ম্মই যে বন্ধন, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে এই কথা বলে।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাঽশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি।
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ।

অর্থাৎ কর্ম্ম শুভই হোক্ আর অশুভই হোক্, যে পর্য্যন্ত না ক্ষয় প্রাপ্ত হয় সে পর্য্যন্ত শত কল্পেও মনুষ্যদিগের মুক্তি হয় না। যেমন লৌহময় পাশেও বাঁধা যায়, স্বর্ণ পাশে বাঁধা যায়, তেমনি শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্মের দ্বারাই জীব বদ্ধ হইয়া থাকে।

লৌহময় পাশ অপেক্ষা স্বর্ণময় পাশ আম[illegible] বিবেচনা[illegible] [illegible] কারণ, [illegible] বন্ধন ছেদন করিবার [illegible]

[illegible] বাড়িবে, যত[illegible] [illegible]
সাধারণের দুঃখ [illegible]

বাসনাও বলবতী হইয়া উঠিবে। এই দুঃখময় অ
অপূর্ণ মানবসংসারে প্রকৃত সাধুলোকের কর্ম্মই সর্ব্বা
অধিক।

এই প্রশ্নোত্তরমালাতেও সে কথা একপ্রকার স্বীকার ক
হইয়াছে। এক স্থলে বলা হইয়াছে, "তিনিই বোধিসৎপদের যা
যাঁহার নৈতিক ও ধর্ম্মবৃত্তির বিকাশ অপর সকল লোক অপেক্ষ
শ্রেষ্ঠ ও পরজন্মে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইবেন
তাঁহার তদ্রূপ অবতীর্ণ হইবার কারণ এই যে, মানবের অজ্ঞা-
নতা জন্য তাহার প্রতি তাঁহার দয়া এত প্রগাঢ় এবং তাহাকে
দুঃখের কারণ ও দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় শিক্ষা দিবা
মঙ্গলেচ্ছা তাঁহার এতই প্রবল যে, তিনি যে পর্য্যন্ত মনুষ্যকে বুদ্ধ
লাভের উপযুক্ত না করিতে পারেন সে পর্য্যন্ত তিনি বারম্বার
ইচ্ছাপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে বুদ্ধত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া
ধর্ম্মপ্রচারান্তর জন্মচক্রের সীমা অতিক্রম করতঃ পূর্ণমুক্তি পর-
নির্ব্বাণের অবস্থায় গমন করেন।"

যে পর্য্যন্ত একজন জীবও দুঃখভোগ করিবে সে পর্য্যন্ত
দয়ার বিরাম নাই। অতএব দয়াবৃত্তির চর্চ্চা করা যদি বৌদ্ধ-
ধর্ম্মের উপদেশ হয়, তবে বাসনাবন্ধ মোচন করিয়া আশু নির্ব্বাণ-
লাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এপদ্ধতি অনুসারে জগ-
তের যাবতীয় জীবের একত্র নির্ব্বাণ ছাড়া নির্ব্বাণের উপায় নাই।
কোন কালে সমগ্র জীবের বুদ্ধপদপ্রাপ্তির আশা আছে কি না
এগ্রন্থে তাহার কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই।

[illegible]ন্তু, যদি দুঃখনাশই একমাত্র [illegible]
সমুদয় কামনা, সুতরাং সদসৎ স[illegible]
আমি জন্মদুঃখ হইতে নিষ্কৃতি প[illegible]